প্রথম প্রকাশ
জুলাই ১৯৫৯

প্রকাশক
সুমন চট্টোপাধ্যায়
রত্নাবলী
৫৯এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
অপরূপ উকিল

কলেজ স্ট্রীটে প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক :
কাকলি প্রিণ্টার্স
কলকাতা-৭০০ ০০৯

# ১

# কথারম্ভ

কবিতার তিনি শত্রু হোন অথবা হোন মিত্র, একথা তর্কাতীত সত্য বলে সকলেই স্বীকার করবেন 'কাব্য সে জীবনের'। 'কবিতা' শব্দটা প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকদের পন্থায় সম্প্রসারিত অর্থে গ্রহণ করলেও মতপার্থক্যের অবকাশ নেই যে, সাহিত্যের উপাদান ও উদ্দেশ্য জীবনকেন্দ্রিক। কাব্য-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শত্রুরূপে গণ্য যে-প্লেটো তিনি একশ্রেণীর আনন্দদায়ক কাব্য ও তার স্রষ্টাদের প্রতি বিমুখ হয়েছিলেন মুখ্যতঃ সেকালের গ্রীকদের অনৃত ভাষণে অভ্যস্ত ও ভাবাবেগ প্রবণ হয়ে ওঠার আশংকায়। তদীয় শিষ্য অ্যারিস্টটল সুনিশ্চিত ছিলেন যে, কাব্যের বিশ্ব এই নিত্য বিবর্তনশীল বিশ্ব থেকে স্বতন্ত্র নিয়মের অধীন। তাই হোমারের বিরুদ্ধে প্রোটাগোরাসের অভিযোগ খণ্ডন করেছিলেন তিনি তাঁর 'কাব্যতত্ত্ব' গ্রন্থের ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে; এবং একাধিকবার নানাভাবে জানিয়েছিলেন ঘটমান বা পুরাঘটিতের নয়, সম্ভাব্যের অনুকরণই শিল্পীদের কাছ থেকে কাম্য। কাব্য-সাহিত্যকে ইন্দ্রিয়-নির্ভর জগতের অবিকৃত প্রতিবিম্ব রূপে গণ্য করায় *Ideai*-এর জগৎ তথা একমাত্র সত্য জগৎ থেকে দূরস্থ যে সৃষ্টি তাকে প্লেটো নিছক মিথ্যা ছাড়া ভাবেন নি অন্য কিছু। কিন্তু মানবজীবনের গভীরে আছে গুহাহিত, গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এক পরম সত্য এবং তা মূল্যবান ও স্থান-কালের স্পর্শেও অমলিন—একথা জানতেন অ্যারিস্টটল। তাই সত্য-মিথ্যার বোধ তাঁর কাছে ছিল গুরুর থেকে স্বতন্ত্র। অনন্ত সম্ভাবনাময় মানুষ ও তার জীবন সম্পর্কে সচেতন না থাকলে প্রোটাগোরাস কদাপি লিখতে পারতেন না 'Man is the measure of all things.' প্রোটাগোরাস তো প্লেটো-আরিস্টটলের অগ্রজ দার্শনিক। সুতরাং মানবকেন্দ্রিক দার্শনিক ভাবনা প্লেটো-অ্যারিস্টটলের পূর্বেই গ্রীসে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। তবে কাব্যকে জীবনের পাশে স্থাপন করে জীবনের নিরিখে কাব্যের বিচার করতে গিয়ে সক্রেটিস-শিষ্য প্লেটো ঘোষিত হলেন কাব্যের শত্রুরূপে। অন্যদিকে কাব্যকে কাব্যরূপে স্বতন্ত্র মানদণ্ডে বিচার করে নতুন দৃষ্টিকোণ উন্মোচন করে দিলেন বিচিত্র শাস্ত্রানুশীলনে দক্ষ চিকিৎসক-সন্তান অ্যারিস্টটল। প্লেটো-অ্যারিস্টটল গত হয়েছেন সে তো বহুকাল হল। কিন্তু কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে তাঁরা যে ভিন্ন দৃষ্টি পথের দিশারী হয়েছিলেন আজও তার গুরুত্ব অপরিসীম। 'শিল্পের জন্য শিল্প' না 'জীবনের জন্য শিল্প'?—এই প্রশ্ন কাব্যরসজ্ঞদের তর্কযুদ্ধে উদ্দীপিত করে আজও এবং হয়ত করবে আগামী দিনেও, যেহেতু যুযুধান দুপক্ষই যুক্তির অস্ত্রে সুসজ্জিত। এই দুই অর্ধসত্য মতাদর্শের জন্ম হয়েছিল সেই প্রাচীন গ্রীসে এবং পূর্বোক্ত গুরু-শিষ্যের হাতে। অথচ একই সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি আসক্ত থেকেও টেক্সট্-নির্ভর সাহিত্য বিচার এঁদের আগেই করেছিলেন অ্যারিস্টফিনিস তাঁর *The Frogs* নাটকে। কিন্তু উত্তরকালে প্লেটো পরম কাব্যরসজ্ঞ হলেও রাষ্ট্রের সুস্বাস্থ্যের চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন; এবং অ্যারিস্টটল শুদ্ধ ও পরিশীলিত মনে নিছক সাহিত্যের আস্বাদন সম্ভব, একথা ঘোষণা করলেন প্রাজ্ঞ দার্শনিকের ভূমিকা থেকে।

একজন প্লেটো এবং একজন অ্যারিস্টটল দীর্ঘকাল ধ'রে য়ুরোপীয় সাহিত্য-বিচার পদ্ধতির উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয়

সাহিত্য এবং সাহিত্য-বিচারের পদ্ধতি (তথা অলঙ্কারশাস্ত্র ) অনেককে নিয়ে নিজস্ব রূপে গড়ে উঠেছিল স্বল্পকালের মধ্যে। ভরত থেকে বিশ্বনাথ ও জগন্নাথের কালগত ব্যবধান কত শতকের? আর কতদিনের ব্যবধান প্লেটো থেকে জাঁ পল সার্ত বা জন ডিউই-র? সংস্কৃতে কাব্য-সাহিত্য রচনার মতই আজ থেমে গিয়েছে ঐ ভাষায় অলঙ্কারশাস্ত্রের চর্চা। সাহিত্য-বিচার পদ্ধতির অনিবার্য নিয়তি তো এটাই। সৃষ্টির অনুগ সে। তার স্বতন্ত্র আত্মস্বরূপ গঠন অথবা আত্মোন্মোচনের উপায় নেই। প্রাচ্যের আলঙ্কারিকেরা সূত্রাকারে জানিয়েছেন আপন সিদ্ধান্ত, নিজে অথবা অন্য কেউ 'বৃত্তি'তে ব্যাখ্যা করেছেন সূত্রবদ্ধ সিদ্ধান্ত এবং খণ্ডন করেছেন অগ্রজ প্রতিপক্ষের ভিন্ন মত। যুক্তির পারম্পর্যে অপরের একটি অক্ষর অথবা একটি মাত্রাও উপেক্ষিত হত না তাঁদের কাছে, কিন্তু এ ভাবে অগ্রসর হওয়ায় তাঁরা তর্কের তুফান তুলেছিলেন যতটা, ততটা মনোনিবেশ করেন নি আশপাশের কিছু সমস্যার দিকে। ফলে সহৃদয়সামাজিকচিত্তে রসসৃষ্টি নিয়ে যে পরিমাণ ভেবেছেন ও বলেছেন, ততটা বলেন নি স্বয়ং লেখক সম্পর্কে। এমন কি, ততটা ভেবেছিলেনও কি? মহৎ সৃষ্টি জন্ম নেয় অপ্রাকৃত কোন উৎস থেকে—এই বিশ্বাস প্লেটোর ছিল। সৃষ্টির শক্তি সঞ্চয়ের জন্য 'মিউজ'-এর দ্বারস্থ হয়েছিলেন হোমার থেকে মিল্টন পর্যন্ত অনেকে। এই 'মিউজ'-এর ভারতীয় সংস্করণ 'সর্বশুক্লা সরস্বতী', যার বন্দনা করেছিলেন আচার্য দণ্ডী। ভট্টতৌত তাঁর 'কাব্য কৌতুক'-এ এঁকেই প্রণাম জানিয়েছিলেন। অপূর্ববস্তুনির্মাণ-ক্ষমতা, যার অপর নাম প্রতিভা, বামনাচার্য তাকে বলেছিলেন 'কবিত্ববীজ'। বামনের পর 'কাব্যমীমাংসা' প্রণেতা রাজশেখর 'প্রতিভা'কে বললেন 'মানসপ্রত্যক্ষ'। এই 'মানসপ্রত্যক্ষ' কথাটি পড়লেই মনে পড়ে কান্ট-এর genius সম্পর্কে অভিমত: **Genius is the innate mental disposition ( ingenium ) through which nature gives the rule to art···genius is a talent for producing that for which no definite rule can be given···Hence originality must be its first property.**[১]

'দক্ষতা' যে অর্জিত শক্তি এবং প্রতিভা 'সহজাত ও মৌলিক' এ বিষয়ে কান্টের সিদ্ধান্তের কোন বিরোধিতা ভারতীয় আলঙ্কারশাস্ত্রে নেই। কিন্তু প্রতিভা-কে 'কারয়িত্রী' ও 'ভাবয়িত্রী' এই দু'ভাগে বিভক্ত করলেও সন্দেহ নেই স্রষ্টার চেয়ে রসিকই ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মনোযোগ দাবি করেছিলেন বেশী। পুনঃ পুনঃ কাব্যানুশীলনের পরিণামে স্বচ্ছতাপ্রাপ্ত হয় পাঠকের 'চিত্তমুকুর'। সেখানে প্রতিবিম্বিত কাব্যরূপই কাব্যের যথার্থ পরিচয়। কিন্তু ভারতীয় আলঙ্কারিকদের এই সহৃদয় সামাজিকেরা কোন সাধারণ মানুষ বা Common people ন'ন। রাজানুকূল্য পুষ্ট সাহিত্যে সাধারণ মানুষের কোন প্রবেশাধিকার ছিল না। যন্ত্রযুগ শুরুর আগে শ্রুতিনির্ভর কাব্যশাস্ত্র প্রতিষ্ঠা পেত শিক্ষাগুরুর কৃপায়। ফলতঃ কাব্য-নাটকের চরিত্রের মত কাব্যশাস্ত্ররসিকদের মধ্যেও সাধারণ মানুষের স্থান ছিল না। রাজতন্ত্রের সাহিত্যে

১. *Critique of Judgment : Second Book* § *46*. Translated by J. H. Bernard

জীবন বলতে বিত্তবান রাজপুরুষদের জীবন বোঝাত। তুলনায় নগররাষ্ট্রে বিভক্ত প্রাচীন গ্রীসের মহামতি প্লেটো ও অ্যারিস্টটল যাদের নৈতিক চরিত্র শোধনের কথা ভাবতেন অথবা ভাবতেন তুষ্টির কথা, তাঁদের সামাজিক মর্যাদা কালিদাস-ভবভূতি-ভারবি-শূদ্রকের শ্রোতাদের তুলনায় অনেক কম ছিল। সুতরাং কাব্যতত্ত্বে সাধারণের প্রবেশাধিকার না থাকলেও পাশ্চাত্যে কাব্য এবং নাট্যোপভোগে ব্রাত্যজনেরা অপাঙক্তেয় বিবেচিত হতেন না। সেই কারণেই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের বিকাশ একজায়গায় স্তব্ধ হলেও জীবনমুখী সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড নিরূপণের দ্বারা পাশ্চাত্য সমালোচনা-সাহিত্য আজও ক্রমাগ্রগামী। রোমের ভারততত্ত্ববিদ Reneiro Gnoli দশম শতকের অভিনবগুপ্তাচার্যের চিন্তার সঙ্গে কান্টের মতাদর্শগত মিল লক্ষ্য করেছিলেন। আবার কয়েক দশক আগে ফ্রান্সের সার্ত যখন বলেন 'reading is a free dream' [২] এবং লেখক ও পাঠক 'Both of them make a free decision' [৩] অথবা 'my freedom by revealing itself, reveals the freedom of the other' [৪] তখন কি আমাদের মনে হয় নি যে স্রষ্টা ও সহৃদয় সামাজিকের মধ্যে সামাজিকের গুরুত্ব স্বীকার করতেন সার্ত ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মতই। পাশ্চাত্য-সাহিত্যবিচারে শৈলীবিজ্ঞান এবং অবয়ববাদী দৃষ্টির ব্যবহার পূর্বপ্রান্তের আধুনিক সমালোচকদের আন্দোলিত করেছে, যদিও মাত্র একদশক আগেই এক মার্কিন জার্নাল-এ 'শৈলীবিজ্ঞান একটি অচল পদ্ধতি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এবং জোনাথান কুলার [৫] অবয়ববাদী বিচার নিয়ে বহু কথা বলে অবশেষে 'অবয়ববাদের পরে কী?' এই রকম একটি প্রশ্ন উদ্যত করে রেখেছেন। প্রাচ্যের আলঙ্কারিকেরা কাব্যদেহের উপাদান, কাব্যের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন করতে করতে কাব্যের আত্মানুসন্ধানে জিজ্ঞাসু হয়েছিলেন। কাব্য বিচার অথবা কাব্যের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে বিব্রত হন নি। কিন্তু রীতিতত্ত্বের আলোচনায় অথবা ধ্বনিতত্ত্ববিচারে ভারতীয় প্রাজ্ঞ আলঙ্কারিকেরা প্রতীচ্যপ্রেমিক আমাদের সম্মুখে অসামান্য দূরদ্রষ্টার মহিমায় যখন উপস্থিত হন তখন ব্যথা একটাই যে স্বদেশী সমালোচনাশাস্ত্রের প্রচুর সম্ভাবনাকে যুগোপযোগী মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নি আমরা। গ্নোলি বললে তবে অভিনবগুপ্তের মহিমা আর স্টাইলিস্টিক্স-তত্ত্বের অন্দরে প্রবেশ করলে জাগে বামন অথবা কুন্তকের স্মৃতি, রিচার্ডস-অগডেন আনন্দবর্ধনের মত কিছু বললে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি বিনত হই। কিন্তু তারপর ?...

তারপরই আমাদের আবার দ্বারস্থ হতে হয় পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বের। যেহেতু অতীতে আমরা ভাবি নি সামাজিক ভাবপ্রেরণার কথা, কেমন করে সমাজ সাহিত্যকে এবং সাহিত্য সমাজকে পরিবর্তন করে, সুতরাং সাম্প্রতিকের পরিবর্তিত পটপ্রেক্ষায় আমাদের ভাবতেই

২. *What is Literature ? (1948)*
৩. *Ibid* P. 40
৪. *Ibid*
৫. *Structural Poetics*

হচ্ছে সেই কথা। যেহেতু অতীতে প্রতিশব্দ এবং অন্বয়ে ছিলাম আমরা নিবিষ্ট, ভাবি নি কাব্য-সাহিত্যকে টুকরো করে বিশ্লেষণ করা ছাড়াও নানা পন্থায় তাকে উপভোগ করা যায় এবং প্রতিটি পদ্ধতিই এক এক রঙের বিচ্ছুরণ ঘটায়, তাই বর্তমানে চলেছে পাশ্চাত্ত্যের অনুগামিতার দ্বারা পূর্বপুরুষের ঋণশোধের পালা। কালিদাস মানেই যে উপমা নয়, কঠিন আবরণের মধ্যে সরস উপাদেয় নারিকেলের উপমানই যে ভারবি সম্পর্কে শেষ কথা নয়—এ সব সত্য বোঝার দিন আমাদের এসেছিল মাত্র শতবর্ষ পূর্বে। সাহিত্য যে একটি সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং কোন রাষ্ট্রনেতার চেয়ে তার ভূমিকা প্রয়োজনে কম বিপ্লবী নয় আজ এ বিশ্বাস এক বলিষ্ঠ পক্ষের মধ্যে সঞ্চারিত। তবু কি সবাই ছেড়েছি এই প্রত্যয় যে, কাব্য দেবে আনন্দ এবং যশস্বী করবে স্রষ্টাকে, উপদেশ দেবে কান্তাসম্মিত পদ্ধতিতে? যদিও রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, দাশরথির পাঁচালী ঠিক তাঁর একলার নয়, যে-সমাজ সেই পাঁচালী শুনেছে তার সঙ্গে একযোগে রচিত; তথাপি 'ইকনমিকসের অধ্যাপক' 'বায়োলোজির লেকচারার' এবং 'সোসিওলোজির গোল্ড মেডালিস্ট'দের সম্পর্কে তাঁর আতঙ্কও তো নিদারুণ সত্য। যতই কেন তিনি 'সমাজ' কথাটা ব্যবহার করুন, তিনি তো কিছুতেই মার্কসীয় পন্থায় বিশ্বাসী ক্রিস্টোফার কডওয়েল-এর মত বলতে পারতেন না :

> 'Art is the product of society, as the pearl is the product of the oyster, and to stand outside art is to stand inside society.'[৬]

এমন কি যে বঙ্কিম তাঁর 'বিষবৃক্ষ' শেষ করে ঘরে ঘরে অমৃতফল লাভের বাসনা জ্ঞাপন করেছিলেন এবং এদেশের নব্য লেখকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, 'সৌন্দর্য সৃষ্টি' অথবা দেশ ও জাতির মঙ্গল সাধনই সাহিত্যিকের লক্ষ্য, অথবা সমাজই গুরু; সেই বঙ্কিম প্লেটো বা রাস্কিনের যত কাছের মানুষ, যত কাছের মানুষ মিল বা বেন্থামের, তার শত অংশের এক অংশেও মার্কসবাদীদের সন্নিকট ছিলেন না। হয়ত বাঙলা সাহিত্যে সমালোচনা পদ্ধতি যখন অঙ্কুরিত মাত্র তখন তা সম্ভবও ছিল না। এমন কি পরেও যখন রুশবিপ্লবের সাফল্যের পর মার্কসীয় সাহিত্যাদর্শ ক্রমে বিশ্বে একটি মতবাদ রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তখনও Vulgar Marxist-রা 'বেস' এবং 'সুপারস্ট্রাকচার'-এর সরলরৈখিক সম্পর্কের বিভ্রান্তিতে ভুগেছেন এদেশে। এই বিভ্রম পাশ্চাত্ত্যেও ঘটেছিল এবং এঙ্গেলস-এর জীবদ্দশাতেই। ১৮৯০-এ ব্লকের (Bloch) কাছে লেখা এঙ্গেলস-এর চিঠিতে তার প্রমাণ আছে। ১৮৫১-'৫২ এর 'লুই নেপোলিয়ঁর অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার'-এ মার্কস 'সুপারস্ট্রাকচার' কথাটা প্রথম ব্যবহার করেছেন। সাত আট বছর পর ১৮৫৯-এর *A Contribution to the Critique of Political Economy*-র মুখবন্ধে মার্কস বলতে চাইলেন, সামাজিক রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক জীবনের বিভিন্ন দিককে পরিচালিত করেছে 'Mode of pro-

৬. *Illusion and Reality*—Seven Seas Books. P. 18

duction of material life' মার্কস-এঙ্গেলস বিরোধিতা করেছিলেন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজ বিন্যাস থেকে শিল্প সাহিত্য প্রভৃতিকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করার ভাববাদী প্রবণতাকে। কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টির মৌলিক রহস্যকে বুঝতে না পারার জন্য মার্কসীয় সিদ্ধান্তের অপপ্রয়োগ ঘটিয়েছেন তথাকথিত মার্কসবাদীরা। উল্টো দিক থেকে ভাববাদীরাও তাঁদের অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে অটল থেকে সাহিত্যসৃষ্টির উৎসে খুঁজে পেলেন furor poeticus (Poetic madness)। কিন্তু কাব্য-সাহিত্য যেমন দৈবাধীন নয়, তেমনি অর্থনীতির বেত্রশাসিতও নয়।

॥ খ ॥

যুগের বদল ঘটে, বদল ঘটে অর্থনৈতিক অবস্থার এবং সাহিত্য-রূপেরও। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব একটা সাহিত্য সৃষ্টির ধারা থাকে, থাকে স্বতন্ত্র সাহিত্য-বিবেকও। তথাপি সাহিত্য দেশ-কালের খড়ির গন্ডিতে বদ্ধ নয়; স্বাধীনতা তার জন্মগত মৌলিক অধিকার। সাহিত্যের উদ্দেশ্য নিয়ে একই দেশের চিন্তানায়কদের মধ্যে একই কালে মতান্তর ঘটেছে— এই দৃষ্টান্ত পূর্বে ও পশ্চিমে অবিরল। কিন্তু জীবনের পরিচর্যা সব শিল্পের সাধারণ ধর্ম হলেও সর্বত্র স্বীকৃত যে, বিশেষ ধর্মে সাহিত্য বাণীময়। চিত্রের প্রত্যক্ষতা ও সংগীতের গতি তার কাছে গ্রহণযোগ্য পরধর্ম মাত্র। 'স্থাপত্য,' 'ভাস্কর্য' মাধ্যম ও পদ্ধতি-গত কারণে সাহিত্য থেকে ভিন্ন গোত্রের। উদারপন্থী হয়ত সব কিছুকেই ভাষা বলে চিহ্নিত করবেন, যেহেতু কোন কিছুর দিকে ইঙ্গিত করাই ভাষার স্বভাবধর্ম। কিন্তু বিশেষ লক্ষণ বলে যদি সাহিত্যে থাকে কিছু তা হ'ল তার ভাষা—শব্দ ও অর্থের পার্বতী-পরমেশ্বর সম্পর্ক। এই ভাষাই সাহিত্যের রূপ—'বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি' ও 'তদ্বিদাহ্লাদকারিণি'। এ বিষয়ে সতর্ক অ্যারিস্টটল তাঁর 'কাব্যতত্ত্ব' গ্রন্থে সমীক্ষা করে-ছিলেন অক্ষর, শব্দাংশ, সংযোজক, বিশেষ্য, ক্রিয়াপদ, শব্দরূপ, ধাতুরূপ ও বাক্য নিয়ে। এ ছাড়া প্রচলিত শব্দ, আগন্তুক শব্দ ও রূপক অলংকার ব্যবহারের বৈচিত্র্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ আলোচনাও করেছিলেন তিনি। ভাষা যে কবিতা বা সাহিত্যের কতখানি তা নিয়ে দেগা-মালার্মে সংবাদ সবারই জানা। পল ভালেরি এই দুই বন্ধুর (দেগা ছিলেন চিত্রকর এবং মালার্মে কবি) কথা উল্লেখ করে কাব্য-ভাষার সার্থকতা তিন দিকে সন্ধান করেছিলেন—জানানো, জাগানো এবং ভাবানো। যে-ভাব ইচ্ছে হয়ে ছিল মনের মাঝরে, ভাষাই তাকে দিল রূপ বা জন্ম। উইটেংস্টিন-এর কথা নিশ্চয়ই সবাই মানি যে, যা ভাবা যায় তার সবটা প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু কেন যে যায় না তার উত্তরটা দিয়ে-ছিলেন কার্ল ইয়েসপার্স। ইয়েসপার্স বললেন, শেষ উত্তরটা যার জানা আছে সে কখনও আপন বিশ্বাস জ্ঞাপনের বিনিময়ে Genuine Communication নষ্ট করে দিতে পারে না। ...দর্শন ও ইতিহাস জানাতে চায়, তাই জ্ঞাপনের ভাষা 'গদ্য'ই দার্শনিক ও ঐতিহাসিকের সম্বল। কিন্তু 'ভাবের কথা' যার অবলম্বন তা কি জ্ঞাপনেই সিদ্ধিলাভ করে? এ বিষয়ে গদ্য-গন্ধী কথা বলেছিলেন কডওয়েল:

Language is a social product, the instrument where by men

> communicate and persuade each other; thus the study of poetry's sources cannot be separated from the study of society.[৭]

কডওয়েল বেশ কয়েক পৃষ্ঠা পরে তাঁর কথাটা আর একটু স্পষ্ট করে জানিয়েছেন। যে ভাষায় ছন্দোতরঙ্গ আছে, সেই ভাষাই কাব্যের এবং তাঁর মতে 'The language of collective speech, is the language of public emotion'।[৮] কবিতার ভাষায় যৌথ জীবনের ছাপ পড়ে। আদিম জীবনের গান ও নাচের সঙ্গে তার গোত্রের অভিজ্ঞতা। হয়ত এই কারণেই পদ্যের ভাষায় আমরা অনেক ক্ষেত্রে লোকপুরাণ বা 'মিথের' চিত্ররূপময় প্রকাশ দেখি। ইয়ুং এবং গর্কি দুটি ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে লোকপুরাণের ব্যবহারিক গুরুত্ব আলোচনা করেছিলেন কাব্যের ক্ষেত্রে। উপমায় রূপকে লোক-বিশ্বাস এমন চমৎকার মিশে থাকে যে এটুকু না থাকলে কাব্যের ভাষা যেন কাব্যিক হয়ে উঠত না। 'চাঁদমুখ, 'Cherry lips'-এর মতো সামান্য কথা থেকে ওয়ার্ডস্বার্থের :

> 'Our birth is but a sleep and a forgetting
> The soul that rises with us, our life's star.
> Hath had elsewhere its setting'

অথবা, রবীন্দ্রনাথের

> 'দেখিলাম, অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
> দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
> নিয়ে অনুভূতি পুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,
> চিত্র-করা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,,
> নিয়ে তার বাঁশিখানি।'

সবই তো ভাষার তরীতে চেপে একাল থেকে সেকালে নিকট থেকে সুদূরে অভিযান।

ওয়ার্ডস্বার্থের 'life's star' বা রবীন্দ্রনাথের 'নিয়ে তার বাঁশিখানি'র মত রোমান্টিক ভাবুকতা নেই বরঞ্চ নিতান্তই ভূমিচারী বহু ভাষাচিত্র, একালের জীবনকে ছুঁয়ে যায় নিপুণ দক্ষতায়। যেমন, এলিঅটের :

> 'When the human engine waits
> Like a taxi throbbing'.

অথবা, জীবনানন্দের :

> 'চারদিকে অগণন মেশিন ও মেশিনের দেবতার কাছে
> নিজেকে স্বাধীন বলে মনে ক'রে নিতে গিয়ে তবু
> মানুষ এখনও বিশৃঙ্খল।'

৭. *Illusion and Reality.* Christopher Caudwell : Seven Seas Books P. 13

৮. *Ibid,* P. 33

এইভাবে ভাষা—সাহিত্যের ভাষা—পাঠকের গড়ে ওঠা পূর্ব সংস্কারকে ঋদ্ধ করতে করতে নতুন সংস্কার তৈরি করে দেয়। তখন আর পাঠকের বিমূঢ় বিস্ময় জাগে না বিষ্ণু দে-র এইসব পঙক্তি পড়তে : 'এখানে সভ্যতা নেই, হৃদয় শুকনো দীঘি বুদ্ধি মজা খাল, চোখ কান সব বোধ চোরাই মালের চেয়ে বাসি/এখানে হয়তো নেই আপামর কোনোই নরক।' এইভাবেই শব্দের পারম্পর্যে গঠিত নিত্য নতুন আভাস-ইঙ্গিতে হয়ে ওঠে পাঠক অভ্যস্ত। মালার্মের কাব্যরীতি যাঁর 'অম্বিষ্ট' সেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন 'কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দপ্রয়োগের পরীক্ষারূপেই বিবেচ্য।' কিন্তু শব্দ 'মুখ্য উপাদান' হলেও কবিতা কি শুধুই শব্দপ্রয়োগের পরীক্ষা? সুধীন্দ্রনাথ নিজেও বুঝেছিলেন, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। তাই একটি অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে লিখলেন, "কিন্তু কাগজ কলম নিয়ে বসতেই দেখলুম যে ক্রোচে-প্রস্তাবিত উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত অক্ষরে অক্ষরে সত্য'। 'উপলব্ধি' অন্তরঙ্গ সত্য আর 'উক্তি'? 'উক্তি'র সংগঠক উপাদান যে-শব্দ তাকে স্পর্শ করে আমাদের 'চোখ' ও 'কান' নামক দুটি বাহ্যেন্দ্রিয়। কিন্তু 'উক্তি'র শেষ সার্থকতা ঐ দুটি ইন্দ্রিয়কেই শুধু তরঙ্গিত করা নয়। 'উক্তি' যতক্ষণ না লেখকের উপলব্ধির অবিকল রূপ হয় ততক্ষণ লেখকের যেমন স্বস্তি নেই, তেমনি পাঠকের বোধও পূর্ণ হয় না শব্দকে অন্তর দিয়ে আলিঙ্গন করতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত। সুতরাং 'ব্যক্ত' শব্দ থেকে 'অব্যক্ত' ভাবলোকে পাঠকের যে অগ্রসৃতি তা সম্ভব হয় না যদি কবি শুধুই রচনা করেন শব্দব্যূহ।

সুতরাং 'কাব্য সে জীবনের' এই মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য কবি সাহিত্যিককে বিষয়গত উপাদান সংগ্রহ করতে হয় অর্থনীতি-শাসিত সমাজ জীবনের ভিত্তি থেকে, সংগৃহীত উপাদানকে দিতে হয় ভাষিক বিগ্রহ, তাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হয় সমকালের কাছে এবং উন্মুখ থাকতে হয় নিকট ও সুদূর আগামীর দিকে। এক অথবা কয়েক শত বছর পরেও তাঁর সম্পর্কে কৌতূহলী থাকুন কোন পাঠক, এই প্রত্যাশা কোন্ সাহিত্যিকের না আছে? কবিকে যাঁরা বলেছিলেন ত্রিকালদর্শী, বলেছিলেন জগৎ স্রষ্টা-সদৃশ কবি-সাহিত্যিকদের কাছে তাঁদের প্রত্যাশা ছিল না কি অফুরন্ত? তা যে অকারণ নয়, তার প্রমাণ ব্যাস-বাল্মীকি কালিদাস-শেকসপীয়র-রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকে। মহাকাল চাপল্য সহ্য করে না, রাখার যেটুকু সেটুকুই রেখে বাকি সব প্রত্যাখান করে পরম অবহেলায়। এই 'মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন' যে-বিচারক সেই বিচারক কে বা কারা? স্বতন্ত্র নিষ্ঠা বা গুণপণাসহ 'ভাবয়িত্রী-প্রতিভা'র অধিকারী সেই ব্যক্তি কোন অংশেই 'কারয়িত্রী প্রতিভা'র অধিকারী স্রষ্টার থেকে ন্যূন নন, অনেকক্ষেত্রে তাঁরা সমান সমান। হয়ত সেই কারণেই পল ভালেরি বলেছিলেন যে, প্রথম শ্রেণীর সমালোচক হলেন কবিরাই। স্রষ্টাই জানেন সাহিত্যের জন্মদাতার আবেগ ও যন্ত্রণা, প্রতিকূলতার স্বরূপ এবং ঐন্দ্বিদের আনন্দ দায়ক হয়ে ওঠার রহস্য।

২

# প্রাক-রবীন্দ্র পর্ব

॥ ক ॥

*Critics are the stupid who discuss the wise*—সমালোচকদের এই তীব্র তিরস্কার যিনি করেছিলেন সেই তলস্তয় নিজেও ছিলেন একজন সমালোচক। কিন্তু এই কথার সঙ্গে সঙ্গে যখন তিনি শেকস্‌পীয়র-গ্যেটে-হ্বাগজার-বিঠোফেন-এর সঙ্গে নিজেকেও স্রষ্টা হিসেবে প্রায় সর্বাংশে নির্দ্বিধায় খারিজ করে দেন তখন কি তাঁকে অবিবেকী অথবা বিকৃত মস্তিষ্ক বলে উপেক্ষা করতে পেরেছেন কেউ? কবি-সমালোচক পল ভালেরি-র 'none but an artist can be a competent critic' এবং 'To judge the poets is the function of the poets'—এই জাতীয় মন্তব্য, অথবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'কাব্যরচনা ও কাব্যবিবেচনা একই ব্যাপারের প্রকারান্তর'-এর মত উক্তি তলস্তয়ের শ্রুতি-গোচর হলে নিশ্চয়ই তিনি যাবতীয় বাক্‌সংযম হারিয়ে বসতেন। আসলে প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক কাউণ্ট পরিবারের সন্তান, তলস্তয় যখন এই সিদ্ধান্তে এসেছেন (তাঁর নেখল্যু-দফের মত) যে, সম্পত্তির উপর মানুষের অধিকার জন্মগত নয়, এবং বঞ্চিত কৃষকশ্রেণীর ন্যায্য দাবির সামাজিক স্বীকৃতি প্রয়োজন তখন তিনি শিল্প-সাহিত্যকে 'লোক শিল্প' এবং 'বিত্তবানদের শিল্প' এই দু ভাগে ভাগ করে শেষোক্ত শ্রেণীর সমস্ত সৃষ্টিকে কলমের আঁচড়ে বরখাস্ত করে দিয়েছিলেন। শেকস্‌পীয়র প্রমুখের দুর্গতি ঘটেছিল ঐ কারণেই। হয়ত নিজের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিকেও একই সঙ্গে উপেক্ষা না করলে তাঁর অস্ত্র তাঁর দিকেই ফিরিয়ে দিতেন অন্য কেউ—*Critics are the stupid who discuss the wise.*

সমালোচক সম্পর্কে তলস্তয়ের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাবলম্বী রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সমালোচকদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন—ব্যবসাদার বিচারক ও যথার্থ বিচারক। তিনি তাঁদেরই যথার্থ বিচারক-এর মর্যাদা দিয়েছিলেন যাঁরা লেখকের 'ঘরের লোক' বা প্রায়-সমানুভূতির অংশীদার। এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তিনি নিজেই। কালিদাসের 'শকুন্তলা', 'কুমারসম্ভব' এবং 'মেঘদূত'-এর সমালোচক রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত সৃষ্টির যে নতুন অর্থ সন্ধান করেছিলেন তা তো তাঁর নিজেরই আবিষ্কার এবং দ্বিতীয় রহিত। তলস্তয় নয়, রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ ও ভালেরি-র সিদ্ধান্তে আস্থা রেখে সাহিত্যিক ও তাত্ত্বিকের মিলন ঘটেছিল যাঁদের মধ্যে আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয় তাঁরাই।

'বাঙ্গালা ভাষার এখন গঠন ক্রিয়া চলিতেছে। বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ রচনার সহিত কালে বাঙ্গালা সাহিত্যে অলঙ্কারশাস্ত্র রচনার আবশ্যকতা আসিবে।'—১৩০৬-এর 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (তৃতীয় সংখ্যায়) 'অলঙ্কার শাস্ত্র' শীর্ষক একটি অতি সংক্ষিপ্ত রচনায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যখন এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন তার আগেই বাঙ্গালায় সাহিত্য সমা-লোচনার একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল যার পুরোভাগে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। তদুপরি রঙ্গলালের দু'একটি মন্তব্যে মধুসূদন দত্তের অন্ততঃ তিনটি সনেট ও ইংরেজিতে লেখা চিঠিপত্রে সাহিত্যের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। অথচ

তা সত্ত্বেও ১৩০৬-এ রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা অলঙ্কারশাস্ত্র গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন যেখানে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি অনুপ্রীতি থাকবে না, যদিও তার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতি উত্তরাধিকারীর অনুরাগ থাকবে। তাছাড়া তখন ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শ বাঙলা রচনায় প্রবেশ করায় বাঙালী লেখক ও পাঠকদের রুচিবোধ এবং সৌন্দর্য বুদ্ধির বদল ঘটেছে। কিন্তু আমরা জানি, সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র তাত্ত্বিক হিসেবে দু'একটি আলংকারিক পরিভাষার ব্যবহার ছাড়া সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের দ্বারস্থ হন নি। তাঁর পথ-প্রদর্শক কোন বিশেষ বিদেশী কাব্যশাস্ত্রী না হলেও পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা পদ্ধতিতেই কি তিনি দীক্ষিত বা শিক্ষিত ছিলেন না? সুতরাং সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে যে বাঙালী-সমালোচকের কাজ চলতে পারে না, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই তা অনুভূত হচ্ছিল। তার কারণ, প্রথমতঃ কালের দীর্ঘ ব্যবধান অর্থাৎ বাঙলা সমালোচনা সাহিত্য গড়ে ওঠার অনেক আগেই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের ধারাবসান; দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবে এদেশে গড়ে ওঠা স্বতন্ত্র রুচিবোধ ও সৌন্দর্যবুদ্ধি; তৃতীয়ত: নতুন সাহিত্য-সৃষ্টির সমান্তরাল রেখায় সাহিত্য তত্ত্ব ভাবনার বিকাশের যে ধর্ম পাশ্চাত্ত্য সমালোচনায় চোখে পড়ে তার গ্রহণ-যোগ্যতা। ... অথচ তা সত্ত্বেও মনীষী রামেন্দ্রসুন্দরের প্রত্যাশা যখন পূরণ হয় নি, তখন বুঝতে হবে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের অলঙ্কারশাস্ত্র রচনা বলতে তিনি চেয়েছিলেন একটি স্বতন্ত্র বিচার পদ্ধতি যার আবির্ভাব ঘটবে পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা সাহিত্য এবং সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের মতই স্বতন্ত্র কোন রূপ নিয়ে, অথবা এই দুটি পৃথক পদ্ধতির সমন্বিত মূর্তিতে। কিন্তু যে কালে প্রত্যেক দেশের মানুষ এবং তার সাহিত্যকর্ম বিশ্বনাগরিকতা অর্জনে উন্মুখ, সেকালে একটি দেশের সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের বিকাশ ঘটবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং স্বকীয় পদ্ধতিতে—তা কি আদৌ সম্ভব? সুতরাং বাঙ্গলা সাহিত্যে অলঙ্কারশাস্ত্র তথা বাঙলা সাহিত্য-তত্ত্ব অর্থে বুঝতে হবে, বাঙালী মনীষীরা সাহিত্য-তত্ত্ব সম্পর্কে কী আলোচনা করেছেন এবং এসেছেন কোন সিদ্ধান্তে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' ভূমিকা থেকে শঙ্খ ঘোষের 'শব্দ আর সত্য' অথবা শিশির দাশের 'গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব'-এর মধ্যে কমপক্ষে একশ পঁচিশ বছরের ব্যবধান। দীর্ঘ এই কাল পর্যায়ে বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের সঞ্চয় যেমন ক্রমবর্ধমান এবং বৈচিত্র্যে বিস্ময়কর, তেমনি তত্ত্বালোচনা এবং সাহিত্য-সমালোচনার ধারা স্বদেশী ঐতিহ্যের সঙ্গে ক্ষীণ সূত্রের সংযোগ রক্ষা করে বিশ্বমুখীন। অতএব এই পর্বের সাহিত্যতত্ত্বালোচনায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের পরিমাণ ও স্বরূপ সন্ধানই আমাদের মুখ্য গবেষণার বিষয়। প্রাচ্য অলঙ্কারশাস্ত্রের নাড়ীর বাঁধন ছিন্ন করে ভূমিষ্ঠ এই তত্ত্বালোচনা পৃথক গোত্র মর্যাদার অধিকারী। উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ ও রসধারায় অগ্রগতি যেমন পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফল, তত্ত্বালোচনাও সৃষ্টির সহচর বলে ঐতিহাসিক কারণেই পাশ্চাত্ত্য মডেল ও সিদ্ধান্ত অনুসারী। রস, ধ্বনি, অলঙ্কার প্রভৃতি গূঢ়ার্থে নয়, নিতান্তই সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঐশ্বর্যে নয়, বিদেশাগত সম্পদের দ্বারা অধমর্ণ বাঙলা সমালোচনা সাহিত্য ক্রমে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

॥ খ ॥

মুখ্যতঃ সংগঠক ও সাংবাদিক রূপে যাঁর প্রতিষ্ঠা সেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রথাবদ্ধ শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে না উঠলেও ছিলেন স্ব-শিক্ষিত। কিন্তু কোন্ প্রেরণা বশে তিনি কবিওয়ালাদের জীবনী সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। কবিদের কাব্য বিচারের ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব একটি রুচি ছিল, নইলে তাঁরই উৎসাহে উদ্দীপিত 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধে'র নায়কদের উদ্দেশে তাঁর নিষেধের তর্জনী কেন উদ্যত হত? তাঁর নিজের রচনা একালীন শালীনতা বোধের মানদণ্ডে হয়ত নিন্দার ঊর্ধ্বে নয়, কিন্তু সেকালে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠায় যাঁরা কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন সেই সমস্ত সম্ভাবনাময় তরুণদের কখনও ঈশ্বরচন্দ্র সীমা লঙ্ঘন করতে দেন নি। সাহিত্যের 'এথিক্স' সম্পর্কে ধারণা না থাকলে এ কাজ কেউ করেন না। যে-কালে কবিওয়ালারাই সাহিত্যের মাঝি-মাল্লা সেকালের রসিকেরা কতটা ভাঁড়ামিতে অট্টহাস্যে ফেটে পড়তেন, কখন আর সহ্য করতে পারতেন না; সেইসব ইতিহাসের খনিতে প্রবেশ করলে কবিওয়ালাদের জীবনী সংগ্রাহক এবং উদীয়মান সাহিত্যিকদের উৎসাহদাতা ও গোষ্ঠীপতি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে একটি উজ্জ্বল রত্ন বলে স্বীকার করা অপরাধ হবে না। দেশ-কাল ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন এই স্ব-শিক্ষিত মানুষটি পদ্যকে ব্যবহার করেছেন মোটা দাগের আঁচড়ের মত। সমস্যার একটা রূপ তিনি দিয়ে গিয়েছেন, বাক্য বিন্যাসে দিয়েছেন 'দেশজ রীতি' এবং 'বস্তুনির্ভর সাধারণ সুস্থ বুদ্ধির সরসতা'। একালের 'রিয়ালিজম' তাঁর কবিতায় নেই, কিন্তু তাঁর প্রতিভার মূল্যায়নে কবি বিষ্ণু দে যা বলেছিলেন তাকে উপেক্ষা করা যায় না:

> 'তিনি মুখ ফিরিয়ে কাব্য সাধনা করেন নি এইটাই বড় কথা। সমাধান যেকালে ইতিহাসেই প্রায় দৃশ্য ছিল না, সেকালে একজন কবির মধ্যে সে দিব্যদৃষ্টি আশা করা অন্যায়। তাই গুপ্ত কবি তিক্ত দ্বিধায় সীমাবদ্ধ'।[১]

ঈশ্বর গুপ্ত কাব্য-তাত্ত্বিক ছিলেন না। কাব্যরসের মাহাত্ম্য ভারতচন্দ্রের মুখে উচ্চারিত হলেও ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন ভোজন রসের রসিক। একালের নিরিখে তা অবশ্য স্থূল এবং অনেকাংশে Vulgar ও। কিন্তু কাব্য জেনে লাভ, কবিকে জেনে আরও লাভ—এই বঙ্কিমী সিদ্ধান্তের অনেক আগে ঈশ্বরচন্দ্র কবিওয়ালাদের জীবনী সংগ্রহ করে জীবনীমূলক সাহিত্য বিচারের গোড়াপত্তন করে যান এবং কবিওয়ালাদের উৎকট চিত্তবিকৃতিতে ভরা কবিগান রচনার কালে উত্তরপুরুষদের যথাসম্ভব নীতির শাসনে বাঁধতে চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ কবিতা সম্পর্কে ঈশ্বরগুপ্তের দু-একটি পঙক্তি এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে যেগুলি ভবতোষ দত্ত-সম্পাদিত 'ঈশ্বর গুপ্তের কবিজীবনী' গ্রন্থে মিলেছে। কবি এবং তাত্ত্বিক কোন দিক থেকেই ঈশ্বর গুপ্ত উত্তরকালের স্বীকৃতি পান নি। কিন্তু মধুসূদনের 'রস' সংক্রান্ত সনেটের আলোচনার আগে এই পঙক্তিগুলি ঐতিহাসিক কারণে উল্লেখের দাবি রাখে:

১. সাহিত্যের ভবিষ্যৎ—বিষ্ণু দে। ভারবি: ১৯৬৯-এর সংস্করণ। পৃ. ৪৫

ক. মনোভাব ব্যক্ত হয়, লোকেতে কবিতা কয়,
আনন্দ বিতরে জনগণে।

খ. নীলাম্বরে আচ্ছাদিতা, মাধব-বনিতা।
ভাবরূপ বসনেতে, আবৃতা কবিতা ॥

গ. কিবা দৃশ্য কি অদৃশ্য, সকলি প্রকট।
অলিখিত কিছু নাই, কবির নিকট ॥

এইরকম গদ্যগন্ধী পয়ার-শাসিত কবিতায় 'কাব্য' বা 'কবিতা' সম্পর্কে দু'চার কথা ঈশ্বরচন্দ্র যা বলেছেন তা কি সেকালে সুলভ ছিল? যদি 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠায় এই জাতীয় মন্তব্যের বিস্তার ঘটত তাহলে বাঙালী সাহিত্যিকের সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনার শুরু সেখান থেকেই ধরা যেত। তাই বাঙলা গদ্যে সাহিত্যতত্ত্ব বা কাব্যতত্ত্বের আলোচনার প্রথম ব্যক্তিরূপে 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' এবং 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র (১৮৫৮) কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখই সংগত। ইংরেজ কবিদের অনেকের কবিতার অংশবিশেষের বঙ্গান্তর করেছিলেন রঙ্গলাল। 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র ভূমিকায় নিজেই স্বীকার করেছেন 'উপস্থিত কাব্যের স্থানে স্থানে অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে।' ইংরেজ কবিদের কাছে অধমর্ণ রূপে ঋণ স্বীকারে রঙ্গলাল এখানে অকপট। কিন্তু রঙ্গলালের বৈশিষ্ট্য এখানে যে, তিনি কালের চাহিদাটা ঠিকই বুঝেছিলেন। সনাতন ঐতিহ্যে সংলগ্ন থেকে প্রতীচ্য সংস্কৃতিতে আকর্ষণ অনুভব করে রঙ্গলাল বললেন, 'ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে কাব্য রচিত হওয়া' যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমনি স্মরণ করা কর্তব্য যে 'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং' এই হল চরম কথা। রসাত্মক বাক্যে কাব্যত্ব-সন্ধানের মুহূর্তে রঙ্গলাল রিচার্ডসনের *Literary Recreation* গ্রন্থের **'Poetry and Utilitarianism'**-এর প্রতি তাঁর আগ্রহ জানালেন। 'কাব্য কী' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রঙ্গলাল জানালেন:

> মিত্রাক্ষরে এবং মিতাক্ষরে রচিত, যতি সমন্বিত, অনুপ্রাসাদি অলংকারে ভূষিত পদ-বিন্যাস করিলেই তাহা কাব্য হয় না। সুবিখ্যাত 'সাহিত্য দর্পণ' গ্রন্থে ইহার যথার্থ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে। যথা—'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং' এই স্বল্পবাক্যে কবিতা বলার গুণ ব্যাখ্যাত, বৃহদ্ গ্রন্থ বিশেষের মর্ম ব্যক্ত হইয়াছে।'

রঙ্গলাল এখানে যে-আলংকারিকের কথা স্মরণ করেছেন তিনি বিশ্বনাথ। 'সাহিত্য দর্পণ' এর প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় কারিকায় তিনি লিখেছেন 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। বিশ্বনাথ এই কারিকার ব্যাখ্যাংশে রস সম্পর্কে ভরত-সূত্রের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। 'সাহিত্যদর্পণ' কালের বিচারে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র সমূহের মধ্যে যেমন অর্বাচীন, তেমনি পূর্বাচার্যদের গ্রন্থের তুলনায় মৌলিকতা-বর্জিত। অথচ, এই 'সাহিত্য দর্পণ'-এর ঘোষিত নির্দেশ অমান্য করতে চেয়েও মধুসূদন দত্ত তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসু-কে এই গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হতে অনুরোধ করেছিলেন এবং জীবনের অন্তিম পর্বে

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও 'রসাত্মক বাক্যই কাব্য' কথাটিকে পরম সত্য বলে ঘোষণা করলেন। ভরতাদির তুলনায় বিশ্বনাথের এই প্রাধান্যের কারণ কী? হয়ত পূর্বাচার্যদের বহু-সিদ্ধান্তের নির্যাস এই গ্রন্থে স্থান পাওয়ায় বাঙালী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই গ্রন্থকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তবে এটা অনুমান মাত্র। তা ছাড়া উনিশ শতকের বাংলা দেশে প্রাচীন ভারতীয় কাব্যে পাঠকদের অনুরাগ যতটা ছিল, অলঙ্কারশাস্ত্র মন্থনে আগ্রহ অবশ্যই সেই পরিমাণ ছিল না। অলঙ্কারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত না হলেও সু-কাব্য রচনা এবং আস্বাদন সম্ভব। রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর ভূমিকায় বিশ্বনাথের সূত্র উল্লেখ ছাড়াও রসের পক্ষে বললেন, কবিতা 'সকল রসের নিদান'। ..কিন্তু এই পর্যন্তই। এরপর তাঁর কাছ থেকে এমন কথা শুনি সম্পূর্ণতঃ না হলেওযা অনেকাংশে প্লেটোর মত: 'কবিতার আর এক গুণ এই তাহা সুষুপ্তপ্রায় মানসিক বৃত্তিচয়কে সহসা জাগরিত এবং উত্তেজিত করিতে পারে।' রিপাব্লিক (দশম)-এ প্লেটো বলেছিলেন :

> Poetry feeds and waters the passions instead of drying them up, although they ought to be controlled, if mankind are ever to increase in happiness and virtue.

কিন্তু রঙ্গলাল সর্বথা প্লেটোনিক নন। কবিতার ঘোষিত শত্রু প্লেটো বিশ্বাস করতেন, নিছক আনন্দদায়ক কাব্য-কবিতা তাঁদের সন্টাসহ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে নির্বাসিত হওয়া উচিত, কারণ তারা সেই সব অনুভূতিকে চেতিয়ে তোলে, সামাজিক কারণে যাদের অবদমন একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু রঙ্গলাল বললেন, কাব্য পাঠের ফলে সাংসারিক ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে 'জাগতীয় সামান্য প্রকার ক্ষণিক সুখ ব্যতীত এক সুনির্মল নিত্য সুখ সম্ভোগের সম্ভাবনা আছে'। নিত্য সুখ যে কাব্য থেকে মিলতে পারে, শুধু একথা নয়, জাগতিক কোন কর্ম থেকেই তা যে লাভ করা সম্ভব তা প্লেটো বিশ্বাস করতেন না।

রঙ্গলাল কবি হিসেবে ঈশ্বর গুপ্তের চেয়ে উন্নতমানের ছিলেন এবং তৎকালীন কাব্য-কবিতাকে সুনিশ্চিত নিপাতের হাতে রক্ষা করার জন্যই 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর ভূমিকায় 'ইউরোপীয় মহাশয়ের উক্তি অনুসারে' কাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যায় অগ্রসর হয়েছিলেন। 'উলঙ্গ আদিরসের কবিতার' চেয়ে বিমলানন্দ দায়িনী 'প্রীতিরস'-এর কবিতাই যে অধিক কাম্য রঙ্গলাল সেকালে তা যথাযথ উপলব্ধি করায় বাঙলা কাব্যের গতিপথ পরিবর্তনের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হয়েছিল। ঈশ্বরগুপ্ত থেকে মধুসূদনের আবির্ভাবের মধ্যস্থলে রঙ্গলাল যে 'হাইফেন' চিহ্নের মত বর্তমান থেকে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়েছিলেন সেই গুরুত্বটুকু অবশ্য স্বীকার্য। রঙ্গলাল প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্ম্মদেবী', 'কাঞ্চীকাবেরী' 'শূরসুন্দরী' প্রভৃতি আখ্যানকাব্যের কবিরূপে। কিন্তু 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর ভূমিকায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' রচনার দু'একটি বাক্য কাব্য সম্পর্কে উচ্চারিত হলেও সাধারণ সাহিত্য-সত্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হিসেবে অবিস্মরণীয়। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সাহিত্য দু'ভাবে আনন্দ দেয় : (ক) সত্যকে প্রত্যক্ষবৎ

ফুটিয়ে তুলে এবং (খ) সত্যকে মনোরম করে প্রকাশ ক'রে। বর্ণিত বিষয়কে মানস-প্রত্যক্ষ করার আনন্দ পেয়েছিলেন মাক্সিম গার্কি বালজাকের প্রখ্যাত উপন্যাস *La peau de chagrin* পাঠ করতে গিয়ে। আন্তন শেকভও একটি চিঠিতে গর্কিকে বলেছিলেন 'আপনি একজন শিল্পী, .. যখন কোন জিনিস বর্ণনা করেন তখন আপনি তাকে প্রত্যক্ষ করেন এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করেন সেটাই প্রকৃত স্টাইল।' রবীন্দ্রনাথ-বালজাক-গর্কি-শেকভদের নাম রঙ্গলাল প্রসঙ্গে উচ্চারণ করলে যে কেউ কৌতুক বোধ করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মাপের এক কবি যিনি বড়জোর সমকালের বাতপ্রবাহের গতিপ্রকৃতিটা ধরতে পেরেছিলেন মাত্র তিনি কি এই সুচিন্তিত মন্তব্যের জোরে আমাদের সমীহ আদায় করে নেন না!—

> যথার্থ কবির চিহ্ন যথার্থ বর্ণন অর্থাৎ কবি যে বিষয়ে বর্ণনা করিবেন, সে বিষয় পাঠ করিতে করিতে বোধ হইবেক, যেন তাহা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হইতেছে।

কিন্তু পাশ্চাত্ত্য কাব্যতত্ত্বকে নিজের প্রতিভা-শক্তির সঙ্গে জারিত করে নিতে পেরেছিলেন যিনি, সেই মধুসূদনই কাব্যতত্ত্বালোচনায় বাঙালী সাহিত্যিকদের অগ্রজ; যদিও চিঠিপত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত সেই সব তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের ভাষা ছিল বাঙলা নয়, ইংরেজি।

॥ গ ॥

প্রচলে আস্থাহীনতা ও প্রবল অসহিষ্ণুতা যাঁর ব্যক্তিমানস ও শিল্পীচিত্তকে দুরন্ত বেগবান করে তুলেছিল, স্থির প্রত্যয়-ভূমি থেকে তত্ত্বোচ্চারণ তাঁর স্বভাবধর্ম নয়। তত্ত্ব গড়ে উঠে সংহত মূর্তি নেয় ক্রমে। সুস্থির মানসিকতা ও প্রজ্ঞাই তত্ত্বের জন্ম দেয়। তাই বিস্ময় মানতে হয় যখন চোখে পড়ে এই সত্য যে, মধুসূদনের মত অস্থির ও চঞ্চল কবির মধ্যে বাস করতেন সংযত গুণী এবং তাঁর শিল্পী-মনের গভীর গোপনে বিরাজ করতেন এক প্রাজ্ঞ বিচারক। শিল্পতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে নিয়মিত প্রবন্ধ একটিও লেখেন নি তিনি, কিন্তু বন্ধুদের কাছে লেখা তাঁর চিঠিপত্রগুলি গভীরতায় ও বৈচিত্র্যে কীটস-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শেলি-র 'ডিফেন্স' বা ওয়ার্ডস্বার্থের 'লিরিকাল ব্যালাডস্'-এর মুখবন্ধের সমতুল কোন প্রবন্ধ কীটস লেখেন নি, কিন্তু জর্জ ও জর্জিয়ানা কীটস-এর কাছে, রেনল্ডস-এর কাছে, অথবা বেইলি-র কাছে লেখা পত্রগুলিতে অকপট আত্মোন্মোচন ঘটেছে সচেতন শিল্প-তাত্ত্বিক কীটস-এর। মধুসূদনও কাব্য এবং নাটক সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন বন্ধু গৌরদাস বসাক, রাজনারায়ণ বসু এবং কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ে কাছে। চিঠি ছাড়া অন্তত তিনটি সনেট লিখেছিলেন মধুসূদন যা কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান— 'কবি', 'কবিতা', 'কল্পনা'।

কে কবি? 'শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন' কবি কি তিনি? উত্তরে 'কবি' সনেটটিতে মধুসূদন 'কল্পনা' শক্তির মাহাত্ম্য স্বীকার করে বললেন, 'সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী/যার মনঃ কমলেতে পাতেন আসন'। 'কল্পনা' আর একটি সনেটের শিরোনাম। এখানে 'কল্পনা'র মহিমা প্রসঙ্গে মধুসূদন বললেন, 'কি স্বর্গে, কি মরতে,

অতল পাতালে/নাহি স্থল যথা, দেবী নহে তব গতি'। অবশ্যই স্মরণে আসে শেকস্‌পীয়রের *A Midsummer Night's Dream*-এর থিসিউস-এর উক্তি 'As imagination bodies forth/The forms of things unknown ; the poet's pen/Turns them to shapes and gives to airy nothing A local habitation and a name.' 'মনের উদ্যান মাঝে কুসুমের সার' যে 'কবিতা-কুসুম রত্ন' সেই কবিতা গড়ে ওঠে যে-কল্পনা সুন্দরীর সহায়তায়, মধুসূদনের মতে সেইই তো বাগ্দেবীর প্রিয়সখী ('কবিতা')। ...এই তিনটি সনেট ছাড়া আরও চারটি সনেটে ভারতীয় আলঙ্কারিকদের দ্বারা বিশ্লেষিত, রসের জ্ঞানগম্য বাস্তবরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন বর্ণনার দ্বারা—'করুণ-রস' 'বীররস' 'শৃঙ্গার-রস' ও 'রৌদ্র-রস'। সুতরাং ভারতীয় রসবাদী আলঙ্কারিক এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত অজ্ঞাত ছিল না মধুসূদনের। অথচ এই সব সনেট লেখার আগেই ১৮৬০-এর ১৫ই মে-র চিঠিতে মধুসূদন তাঁর সুহৃদ রাজনারায়ণ বসুকে জানিয়েছেন, বিশ্বনাথের 'সাহিত্য দর্পণ'-এর নির্দেশে চালিত হবেন না তিনি। কিন্তু এই সত্যও অনস্বীকার্য যে, উক্ত পত্রের শেষ দিকে তিনি লিখেছেন, 'I wish you would take up the subject of criticism.' Criticism বা সমালোচনার জগতে খ্যাতিমান যাঁদের উল্লেখ মধুসূদন করেছেন, তাঁরা হলেন অ্যারিস্টটল-লঞ্জাইনাস-কুইন্টিলিঅন-বার্ক-কেমস-এলিসন-এডিসন-ড্রাইডেন-শ্লেগেল-স্লেয়ার এবং 'সাহিত্যদর্পণ'-এর বিশ্বনাথ। প্রয়োজনে সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্যও নিতে বললেন। একই চিঠিতে বিশ্বনাথের নির্দেশ সম্পর্কে বিরাগ, কিন্তু 'সাহিত্য-দর্পণ'-এর প্রতি আগ্রহ বিস্মিত করে না কি? এই সঙ্গে প্রশ্ন জাগে, বিদেশী যে সব কাব্যতত্ত্বজ্ঞদের উল্লেখ তিনি করলেন, তাঁরা কি তাঁর স্মরণলোকে আবির্ভূত হলেন আকস্মিক ভাবে? না কি কবি-চিত্তের প্রসাদে দীর্ঘদিন পুষ্ট এঁদের স্মৃতি? অ্যারিস্টটলের *Poetics* লঞ্জাইনাসের *Peri Hupsous*, কুইন্টিলিঅনের *Institutio Oratoria* এডিসনের *On the Pleasures of the Imagination, Elements of Criticism* এবং ড্রাইডেনের *Essay on Dramatic Poesy* মধুসূদন কতটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলেন, এই চিঠিতে বা অন্যত্র তার প্রমাণ নেই। কিন্তু কাব্যে নাটকে সমালোচনায় তিনি নিজের জন্য এমন একজন মানুষের জীবন কামনা করেছিলেন যাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হবে গ্রীক ও রোমানদের তুল্য। মধুসূদনের যশোলিপ্সার ক্ষেত্র সমালোচনার দিগন্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছিল, ব্যাপারটা নিঃসংশয়ে তাৎপর্যপূর্ণ।

শ্রেষ্ঠ কবিই সেরা সমালোচক, এমন কথা বলেছেন অনেকে। কোলরিজ-এলিঅট রবীন্দ্রনাথ-ভালেরির মত অনেকের ক্ষেত্রেই সফল কবি একাত্ম হয়েছেন নিপুণ সমালোচকের সঙ্গে। তথাপি কবি ও সমালোচকের কর্মক্ষেত্রের ভিন্নত্ব বিষয়ে সংশয় নেই। সুতরাং স্রষ্টা-সত্তার সঙ্গে সমালোচক-সত্তার প্রভেদ ঘটে যাওয়া খুবই সংগত, হয়ত বাঞ্ছিতও বটে। সৃষ্টি ও বিচার এই স্বতন্ত্র দুই ক্রিয়ার মুহূর্তে ব্যক্তির সত্তা যদি দ্বিধাবিভক্ত না হয়, তাহলে বিচার যথাযথ হয় না। মধুসূদনের প্রতিভা অন্ততঃ এই কারণেও

বিস্ময়কর যে, তাঁর ক্ষেত্রে স্রষ্টা ও বিচারকের দ্বৈত সত্তার মধ্যে বাঞ্ছিত সুষম মিলন হয়েছিল। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রথম সর্গ রাজনারায়ণ বসুর কাছে পাঠিয়ে যখন তিনি লেখেন, 'you must weigh every image, every expression, every line', অথবা 'সুভদ্রা'র ২য় অঙ্ক কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে পাঠিয়ে জানান, 'In reading over my poem, you must look 1st to the imagery, 2nd to the language in which those images and thoughts are expressed ; 3rd to the individual flow of each verse. Do not care for the general effect,' তখন কি সমালোচনার জগতে একজন Analytical পদ্ধতির সমর্থক স্পষ্ট হয়ে ওঠেন না ? Synthesis অপেক্ষা Analysis-এ বিশ্বাসী ছিলেন বলেই কাব্য-বিচারে প্রতিটি শব্দ, চিত্র, ভাষা সম্পর্কে মধুসূদন তাঁর বন্ধুকে সজাগ থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু কি লিখতে হবে জানলেই চলে না, কেমন করে লিখতে হবে, কবি বা নাট্যকারকে তাও জানতে হবে, এই অ্যারিস্টটলীয় নির্দেশ না মানলে এবং সাহিত্য-বিচারে ক্লাসিকপন্থীদের মতই রোম্যান্টিক পন্থীদের রচনার সঙ্গেও পরিচিত না থাকলে রাজনারায়ণ বা কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে মধুসূদন ঐ পথের নির্দেশ দিতেন না।

'শর্মিষ্ঠা'র পাণ্ডুলিপি রাজনারায়ণের কাছ থেকে ফিরে পেয়ে ক্ষুব্ধ কবি, বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন, 'a man's style is the reflection' ; সুতরাং পণ্ডিত রামনারায়ণের কাছ থেকে ব্যাকরণের ভ্রম সংশোধন ছাড়া মধুসূদনের অন্য কিছু প্রত্যাশিত ছিল না। 'স্টাইল' বা রচনারীতির গুরুত্ব সম্পর্কে মধুসূদন যে কথা বললেন তা বুফঁ ( style is the man himself ), কার্লাইল style is the skin, not the coat ) বা আরও অনেকের পক্ষেই মানানসই হত। Style-এর গুরুত্ব সম্পর্কে আস্থার জন্যই মধুসূদন বিশ্বাস করতেন অপরের সাহায্যে কেউ বড় লেখক হতে পারেন না—'I shall withstand or fall by myself.' স্টাইল সম্পর্কে সচেতনতার জন্যই বিদেশী সাহিত্যের ঋণ গ্রহণ সম্পর্কেও তিনি সতর্ক ছিলেন। বিদেশী প্রভাব কোন কবির ক্ষেত্রে কখনও দূষ্য নয়, আবার অপরের দ্বারা প্রভাবিত রচনায় শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য-চিহ্ন লুপ্ত হওয়া সঙ্গত নয়। মধুসূদন তাঁর সমালোচকদের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন যে, তাঁর লেখা যদি বিদেশী সাহিত্য বা সাহিত্যিকদের স্মরণ করিয়ে দেয় তবে তা কি অপরাধ ? মুরের *Orientalism* বায়রনের *Asiatic air*, অথবা কার্লাইল-এর *Germanism* যদি এদের পাঠকদের ক্ষুব্ধ না করে, তাহ'লে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'য় বিদেশী প্রভাব নিয়ে পাঠকেরা কেন ক্ষুব্ধ হবেন ? অপরের কাছে ঋণী হলেও সাহিত্যিক জীবিত থাকেন তাঁর নিজস্ব রচনা কৌশলের মধ্যে, যেখানে তিনি একক এবং সম্রাট। এই বিশ্বাসের জন্যই বলিষ্ঠ প্রতিপক্ষের আক্রমণ সম্পর্কে সচেতন থেকে আত্মপক্ষ সমর্থনে বিদেশী মহাজনদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন বন্ধুদের কাছে। গৌরদাসের কাছে চিঠির ছলে এ যেন কবির কৈফিয়ত। এই রকম কৈফিয়ত একদা রবীন্দ্রনাথকেও দিতে হয়েছিল বিদেশী সাহিত্যের স্পর্শকে ঘুমন্ত রাজকন্যার অঙ্গে সাগরপারের রাজপুত্রের সোনার কাঠির স্পর্শের সঙ্গে উপমিত করার জন্য। মধুসূদন-বঙ্কিমের পরে আবির্ভূত গুণমুগ্ধ সশস্ত্র

অনুরাগীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রবীন্দ্রনাথ যে-কথা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, মধুসূদনের সেই সুযোগ কোথায়? তাই প্রথমে প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ হয়েও শেষে যেন কৈফিয়তের ঢঙে নম্র হলেন, 'I may borrow a necktie or even a waist coat. but not the whole suit.' বিদেশী সাহিত্যের কাছে এই ঋণ প্রাচীন মতাবলম্বীরা সহ্য করবেন না, নব্যতন্ত্রীরা পারবে না তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে—তা জেনেও হোমার বা মিল্টনের কাছে তিনি সচেতন ঋণী এবং ঋণ-স্বীকারে বিদগ্ধ বহুজনের কাছে অকপট। ঋণের বোঝা যে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ম্লান করবে না, হোমারের কাব্য-সৌন্দর্য ও বাল্মীকির কাব্যসুধা যে এক পাত্রে পরিবেশন করা সম্ভব, একথা উনিশ শতকের প্রতিকূল পরিবেশে উপলব্ধি নিঃসন্দেহে বিদ্রোহী শিল্পী ও প্রজ্ঞাবান তাত্ত্বিকের সুসমঞ্জস মিলন ঘোষণা করে। শিল্পীর সচেতনতা আরও স্পষ্ট হয় যখন শুনি বাল্মীকির কাছ থেকে যথাসম্ভব স্বল্প গ্রহণ করে নিজ প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ নেবেন যেমন, তেমনি যুদ্ধ-বিগ্রহ পূর্ণ হোমারের কাব্যকাহিনীও সর্বদা অনুসরণ করবেন না। মধুসূদনের এই অভিমতে তাঁর যে বিচার-বোধ কাজ করেছে, তা হ'ল ঔচিত্যবোধ। ঔচিত্যবোধের দ্বারাই কোনও সাহিত্যিককে চালিত হতে হয়। প্রাচ্যের কাব্য পাঠে অভ্যস্ত পাঠকেরা হোমারীয় যুদ্ধ-বিগ্রহের দৃশ্যে আকৃষ্ট না হতে পারেন, আবার অন্যদিকে প্রাচ্যের বাল্মীকির অন্ধ অনুসরণ উনিশ শতকের বাঙালী পাঠকদের উপভোগ্য নাও হতে পারে। পাঠকরুচি গঠন করা যেমন পথিকৃৎ সাহিত্যিকের এক অলিখিত দায়িত্ব, তেমনি নব্যতার প্রলোভনে পাঠকদের চৈতন্যে আঘাত না-করাও তাঁর অবশ্য কৃত্য। স্রষ্টা মধুসূদনের অন্তরে যদি সমালোচক মধুসূদনের সক্রিয় অস্তিত্ব সত্য না হত, তাহলে এই বোধের দ্বারা তিনি কদাপি পরিচালিত হতেন না।

'প্যারাডাইস লস্ট'-এর কবি জন মিল্টনের প্রতি মধুসূদনের ছিল অন্তহীন শ্রদ্ধা। এই অনুরাগবশতই তিনি বলেছিলেন: (ক) ভার্জিল, তাসো বা কালিদাস মহৎ কবি, কিন্তু তাঁরা mortal, আর মিল্টন স্বর্গীয়; (খ) মিল্টনের কবিতা নির্জন নিস্তব্ধ অরণ্যে সিংহের গর্জন; (গ) তাঁর 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর শয়তানের মত মিল্টনও ছিলেন 'full of the loftiest thoughts, but has little or nothing that may be called amiable. He elevates the mind of the readers to a most astonishing height but he never touches the heart.' ফলে তাঁর কবিতা শুধুমাত্র স্পর্শ বা আবিষ্ট করে না, কাব্য পাঠকের মনকেও বিস্ময়কর সমুন্নতি দান করে। মিল্টনের কাব্যবিচারে মধুসূদনের এই মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয় লঙ্গাইনাসের 'সাব্লাইম' তত্ত্ব—

> For by some innate power the true sublime uplifts our souls; we are filled with a proud exaltation and a sense of vaunting joy, just as though we had ourselves produced what we had read.

মধুসূদনের শেষ বাক্যটি এবং লঞ্জাইনাসের বাক্যের প্রথমাংশ বক্তব্যের দিক থেকে অত্যন্ত কাছাকাছি। মিল্টন সম্পর্কে তাঁর বিচার বিস্মিত করে যখন শুনি 'He is Satan himself.' সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার অন্তরের ঐক্যানুসন্ধান, শিল্পে শিল্পীর 'পার্সোন্যালিটির সূত্রান্বেষণ, এতো অ্যারিস্টটলীয় ধারণায় সীমাবদ্ধ নয়। এই ধারণার বিস্তার ঘটেছে একালে। ওয়াল্টার র‍্যালে ('No man can walk abroad save on his own shadow') অথবা, হার্বার্ট রীড-এর মুখে ('What we may really expect in a work of art is a certain personal element') একালে এই ধরনের তত্ত্ব আমরা উচ্চারিত হতে শুনেছি। মধুসূদনের এই তত্ত্ব-ভাবনা তাঁর নিজের সৃষ্টি সম্পর্কেও প্রয়োগ করা সম্ভব। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনা করে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন যখন জানান, ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করতে গিয়ে প্রচুর অশ্রু মোচন করতে হয়েছে তাঁকে তখন রাবণের পিতৃহৃদয়ের সঙ্গে কবির ব্যক্তি হৃদয়ের অবিচ্ছিন্নতা চোখে পড়ে না কি? কিন্তু কোন চরিত্রের মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে মহাকাব্য-স্রষ্টার এই অশ্রুবর্ষণ তাঁর 'ক্লাসিক' স্বভাবকে বিপর্যস্ত করে। মধুসূদন তাই বীর-রসাত্মক মহাকাব্য রচনায় উদ্যোগী হয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। ১৮৬৫'র ২৬শে জানুয়ারি গৌরদাস বসাকের কাছে লেখা চিঠিতে মধুসূদনের আত্মস্বরূপ উন্মোচনটি ছিল নির্ভুল: Of course I am still romantic, for that you know is my nature. এই রোমান্টিক প্রবণতাই কি মিল্টনের ভাবশিষ্যকে ওয়ার্ডস্বার্থ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল? (১৮৪২-এর ৭ই অক্টোবর গৌরদাস বসাকের কাছে লেখা চিঠি দ্রষ্টব্য)।

সাহিত্যবিচারকালে মধুসূদন লেখকের ব্যক্তিত্বের উপর যেমন আলোকপাত করেছিলেন, তেমনি রচনাকাল এবং রচয়িতার মধ্যেও সম্পর্ক-সূত্র অন্বেষণ করেছেন। এই সূত্রেই তিনি ১৯ শতকের মধ্যভাগে আমাদের জাতীয় জীবনে নাটকের সম্ভাবনা খুঁজে পান নি—'this is not the age for the drama to flourish.' কিন্তু কোন্ কালে কোন্ পরিবেশে নাটকের জন্ম সম্ভব তা বলেন নি। তবে মনে হয়, বস্তু-সচেতনতার বিকাশ-মুহূর্তে নাট্যজন্মের যোগ্য পটভূমি এই ধারণা পোষণ করতেন মধুসূদন। নতুবা বলতেন না, আমাদের নাটকগুলি যথার্থ নাটক নয়, এগুলি সবই 'dramatic poems' বা নাট্যকাব্য। অন্যদিকে য়ুরোপের সার্থক নাটকগুলিতে আছে 'Stern realities of life' 'lofty passions', এবং 'heroism of sentiment.' কিন্তু বস্তুজীবন-নির্ভরতা, তীব্র Passion ও Sentiment যেহেতু আমাদের জীবনে নেই, যেহেতু কল্পলোকে বিচরণই আমাদের আন্তরিক বাসনা, তাই এদেশে নাটকের পূর্ণ বিকাশ ঘটে নি। যে দেশে নাট্যজন্মের পরিবেশগত সম্ভাবনা বিকাশ পায় নি, সে দেশের একজন নাট্যকারকে শেকস্‌পীয়রের পাশে বসিয়ে তুলনামূলক বিচারের চেষ্টা যে কতটা ভ্রান্ত, সচেতন সমালোচক মধুসূদনের তা বুঝতে ভুল হয় নি। তাই শেকস্‌পীয়রের নাটকবিচারের সূত্র উনিশ শতকের বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ অনুচিত একথা তিনি স্পষ্টই জানিয়েছিলেন। দেশ ও কাল তো শুধু নাট্যসৃষ্টিকে প্রভাবিত করে না, নাটক

তথা সাহিত্যের সমালোচনা পদ্ধতিকেও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। সৃষ্টি ও সমালোচনার ধারার পরিবর্তন স্থান-কাল-পরিবেশ নিরপেক্ষ নয়; সুতরাং পাঠক বা সমালোচক সম্পর্কে কোন মনোযোগী স্রষ্টাই পারেন না দেশ-কাল কে উপেক্ষা করতে। সতর্ক স্রষ্টা মধুসূদনের অন্তরে যে একজন প্রাজ্ঞ বিচারক বাস করতেন তিনিই কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে জানালেন 'It would shock the audience if I were to introduce a female (a virtuous one) discoursing with a man, unless that man be her husband, brother or father. This describes a circle round me, beyond the line of which I cannot step।' সমকালীন সমাজ-বিশ্বাসের গণ্ডিরেখা অতিক্রম করতে পারতেন না মধুসূদনের মত বিদ্রোহী, এটি বিস্ময়কর উক্তি। কিন্তু শিল্পী যত প্রচণ্ড বিপ্লবীই হোন না কেন, যখন তিনি সমকালীন রসিকের সমর্থন প্রত্যাশী তখন তাঁকে বলতে হয় 'আমার পাঠকদের আমি বীররস আস্বাদনের ক্লেশ ভোগ করতে দেব না। অথবা, 'ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে' অনুপযোগী হলেও সাধারণ পাঠকের কানকে প্রবঞ্চিত করার জন্যই অনিচ্ছাসত্ত্বেও অধিক 'অনুপ্রাস' ও 'যমক' ব্যবহার করেছি।' সত্যি বলতে কী, এমন শিল্পী কি কেউ আছেন যিনি আগামী দিনের রসিকের প্রত্যাশায় বর্তমানকে পারেন উপেক্ষা করতে? যে দেশের পাঠক ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে নিজেদের কান প্রস্তুত করতে পারেন নি সেই দেশের পাঠকদের চিত্ততুষ্টির জন্য ব্ল্যাঙ্ক ভার্সেও বাধ্য হয়ে অলঙ্কারের অবাঞ্ছিত বাহুল্য যোজনা করতে হয় কবিকে, যেহেতু যশঃপ্রার্থী কবিমাত্রেই কমবেশী সমকালের অনুমোদন-লিপ্সু। সমিল কবিতা পাঠে অভ্যস্ত ব্ল্যাঙ্ক ভার্স-বিমুখ সমকালীনদের বিরুদ্ধে কবির প্রত্যয়পূর্ণ ঘোষণা: 'A true poet will always succeed best in Blank verse as a bad one in Rhyme' অথবা 'Blank verse and its melody and power astonish me'।—যতই বলিষ্ঠ শোনাক না কেন, যে-পাঠক বা শ্রোতাদের কাছে লেখক তাঁর কাব্য বা নাটক উপস্থিত করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রবীণেরা এমন কোন কিছুকে কবিতা বলতে অসম্মত যা সংস্কৃতের প্রতিধ্বনি নয় এবং নবীনেরা বাঙলা ভাষায় ততটা দক্ষতা অর্জন করেন নি যাতে তাঁরা যা পড়েন তা-ই বোঝেন। এঁদের উপেক্ষা করার কতটা ক্ষমতা রাখেন একজন কবি তা অবশ্যই চিন্তার বিষয়। আসলে 'প্রমিথিউস যত বজ্রকণ্ঠই হোন, তিনি তো কালের জিউ-র হাতে বন্দী। তাই আগামী সত্যযুগের স্বপ্নেই কবিকে বিভোর থাকতে হয় যেদিন 'Sub Blank Verse ho Jaga'—সবই ব্ল্যাঙ্ক ভার্স হয়ে যাবে।

কবি মধুসূদন যুগস্রষ্টা, নাট্যকার মধুসূদনও তাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের আদর্শ যদি সংস্কৃত কাব্য থেকে তিনি পেয়েও থাকেন, বাঙলা ভাষায় তার সার্থক ব্যবহার নিঃসন্দেহে অসাধ্য সাধন। কিন্তু মনে হয় দুরূহতর শিল্প-সাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটেছে নাটকের ক্ষেত্রে। 'কৃষ্ণকুমারী'র রচনাকাল থেকে চিঠিপত্রে নাট্যতত্ত্বের স্বরূপ-সচেতন মধুসূদন আত্মপ্রকাশ করলেন। 'কৃষ্ণকুমারী'র কাহিনী মধুসূদন সংগ্রহ করেছিলেন ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে। কিন্তু ইতিহাসের কাহিনীর প্রতি লেখকের আনুগত্য ততটুকুই

স্বীকার্য, যতটুকুতে নাট্যসম্ভাবনা বিকশিত হতে পারে। নাট্যরচনার মুহূর্তে মধুসূদনের অন্তরস্থ শিল্প-বিচারক কতটা সতর্ক ছিলেন তা তাঁর কয়েকটি ঘোষণা থেকে অনুমান করা যেতে পারে : (ক) কাব্যের অনুরোধে তিনি মাঝে মাঝে বাস্তবকে বিস্মৃত হয়েছেন, কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী'র ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে বিচলিত হতে দেবেন না ; পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে বাস্তবানুগ সংলাপই ব্যবহার করবেন, কবিতা নয়। (খ) নাটকে স্থানগত ও কালগত ঐক্য যথাসম্ভব বজায় রাখবেন। (গ) যেহেতু নাটকখানি ট্রাজেডি, অতএব কোন দৃশ্যকে তিনি পরিহাস-তরল করে তুলবেন না। তবে বৈচিত্র্যের জন্য কোন অনিবার্য কৌতুককর দৃশ্য যথোচিত ব্যবহার করবেন ; শেকস্‌পীয়রও তাই করতেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিই ট্রাজেডি ও কমেডি-র সমন্বয়।...এই তিন সূত্রের প্রথম সূত্র একান্তই আত্ম-সমালোচনা। দ্বিতীয় সূত্রে স্থান ও কালগত যে ঐক্যের কথা বলা হয়েছে তা ইতালীয় কস্তেলভেত্রো-র কাল থেকে প্রতিষ্ঠিত। তৃতীয় সূত্রটিতে ট্রাজেডি ও কমেডি-র মৌলিক পার্থক্য বিষয়ে মধুসূদনের তত্ত্বজ্ঞান শ্রদ্ধাকর্ষী।

প্রতিকূল পরিবেশ, বিমুখ পাঠকদের যন্ত্রণাদায়ক উপস্থিতি মধুসূদনকে মাঝে মাঝে বিচলিত করলেও তাঁর শিল্প-বিচারক-সত্তা তাঁকে আত্মসমালোচনায় তৎপর রেখেছিল। তিনি নন্দনতত্ত্বের ঘূর্ণাবর্ত থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে চেয়েছেন, অথবা বিশ্বনাথ কবিরাজের নির্দেশ অস্বস্তিকর মনে হয়েছিল তাঁর। কিন্তু তা সত্ত্বেও মধুসূদনের মধ্যে আবেগপ্রবণ কবিমনের সঙ্গে কঠোর নিস্পৃহ তত্ত্বজ্ঞানী বিচারকের অসাধারণ সমন্বয় উনিশ শতকের প্রাক-বঙ্কিম পর্বের বাঙলা সাহিত্যতত্ত্বের ইতিহাসে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। স্রষ্টার মুখে সৃষ্টিতত্ত্বের স্বরূপালোচনা বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানীর সিদ্ধান্তজ্ঞাপনের চেয়ে রূপে ও আস্বাদনে যে পৃথক তা তো সন্দেহাতীত। মধুসূদন ইংরেজিতে লেখা তাঁর চিঠিপত্রে কাব্য-নাটকের বিভিন্ন সমস্যার উপর টুকরো টুকরো আলোকপাত করেছিলেন; যদিও তার ঔজ্জ্বল্য ছিল অসাধারণ। একমাত্র মধুসূদনই পারতেন কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে বাঙলায় প্রবন্ধাকারে কিছু কথা লিখে যেতে। বিষয়ে এবং ভাষায় সেই অধিকার তাঁর ছিল। কিন্তু সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কঠোর আত্মশাসনের মিলন ঘটে নি তাঁর মধ্যে। ঘটেছিল যাঁর মধ্যে তিনি 'সব্যসাচী' বঙ্কিম।

॥ ঘ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর এক স্মরণ-সভায় কৃতী পূর্বসূরীর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, 'রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।' 'রচনা' এবং 'সমালোচনা' বলতে রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টা ও সমালোচক বঙ্কিমের কৃতিত্বের কথা স্মরণ করেছেন। বাঙলা গদ্যভাষা তখনও একটি বিশিষ্ট রীতিতে গড়ে ওঠে নি। দুরূহ তৎসমশব্দ-কন্টকিত গদ্যের পাশে চলছিল হালকা চালের মৌখিক ভাষার সঙ্গে আরবি-ফারসীর বিচিত্র সংমিশ্রণে গঠিত গদ্য। বঙ্কিম বাঙলা গদ্যকে শক্তি-পরীক্ষার এমন স্তরে উন্নীত করলেন যার পরিণামে বাঙলাভাষা বিবিধ ভাব-প্রকাশক্ষম একটি নিজস্ব রীতির অধিকারী হয়ে উঠল। ভাবনা ও জ্ঞানের বিভিন্ন প্রদেশে রাজেন্দ্র-

লাল মিত্রের অধিকার, সরস সাহিত্য রচনা ও বিচারে রাজনারায়ণ বসুর দক্ষতা, ঐতিহাসিক সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ের প্রতি ভূদেবের আগ্রহ ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'রচনা ও সমালোচনা' এই উভয় কার্যের ভার বহনে যিনি সামর্থ্যের চূড়ান্ত পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালনে সার্থক হয়েছিলেন তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। স্যর ফিলিপ সিড্‌নি-র *An Apologie for Poetrie*-এর ভূমিকা সম্পর্কে জনৈক সমালোচক লিখেছিলেন :

> It is a kind of formal beginning of literary theorizing by the English man of letters, and the brilliant enough one—written in the high, enthusiastic occasionally a syntactic style of a gifted amateur champion, heading to outdazzle the lowness and myopia of professional moral grumblers.

সিড্‌নি গ্রীক ও রোমান নন্দন তত্ত্বালোচনার ধারা অনুসরণ করে সেকালের নীতিবাগীশ সমালোচকদের হাত থেকে সাহিত্যকে রক্ষা করেন ; আর বঙ্কিম প্রমাণ করেন যে, টীকাকার ও সমালোচকের সত্তা ভিন্ন। ভবভূতির উত্তররামচরিতের (উত্তরচরিত) প্রতিটি অঙ্ক ও দৃশ্যের অনুপুঙ্খ আলোচনা করার পর বঙ্কিম জানালেন যে, এতক্ষণ তিনি পাঠকদের সঙ্গে গ্রন্থখানি আনুপূর্বিক পাঠ করেছেন মাত্র, প্রকৃত 'সমালোচন' করেন নি। প্রকৃত সমালোচনার অর্থ-তাৎপর্য তাঁর কাছে কী ছিল তা স্পষ্টোচ্চারিত হয় নি। তবে সুনিশ্চিত যে, সমালোচ্য গ্রন্থের খণ্ড খণ্ড বিশ্লেষণকে তিনি আদর্শ সমালোচনা বলে গণ্য করেন নি। প্রাচ্যের প্রাচীন আলঙ্কারিকদের পন্থা যে তাঁর নয় তা নির্দ্বিধায় সবিনয় নিবেদন করলেন বঙ্কিমচন্দ্র 'আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি—আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি।' বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্য দর্পণ'-এর 'Dicta'র বন্ধন ছিন্ন করতে চেয়েও 'মেঘনাদবধ' কাব্য ন'টি সর্গে সমাপ্ত করেছিলেন মধুসূদন। কিন্তু আলঙ্কারিকদের-উদ্দেশে তাঁর নম্র নমস্কার জানিয়ে সাহিত্য-সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র চলে এলেন য়ুরোপীয় কাব্যশাস্ত্রীদের জগতে। সাহিত্য সমালোচনা যে ভাষ্যরচনা নয়, সেই সত্য জেনেই বঙ্কিম বললেন,

> এক একখানি প্রস্তর পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। এক একটি বৃক্ষ পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলে উদ্যানের শোভা বর্ণনা করা যায় না। এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মনুষ্য মূর্তির অনির্বচনীয় শোভা বর্ণনা করা যায় না। কোটি কলস জলের আলোচনায় সাগর মাহাত্ম্য অনুভূত করা যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের।

সাহিত্য যে একটি Organic whole, অঙ্গছিন্ন করলে যে তার মূল সত্যে উপস্থিত হওয়া যায় না, বঙ্কিমের এই উপলব্ধি নিঃসন্দেহে য়ুরোপীয় সাহিত্য বিচারের একটি বিশেষ পদ্ধতি স্মরণ করিয়ে দেবে। প্রাচীন ভারতীয় এক নাটককে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে গিয়ে বঙ্কিম সাহিত্যতত্ত্বের আর কতকগুলি মৌলিক সূত্রের সঙ্গে আমাদের সচেতন করে দিলেন :

ক. কবির প্রধান গুণ সৃষ্টিক্ষমতা। ... কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারী এবং সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট না হইলে, কোন প্রশংসা নাই।

খ. কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। ... সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।

গ. কবির আর একটি বিশেষ গুণ রসোদ্ভাবন।

শেষোক্ত উদ্ধৃতিটির 'রস' শব্দটি ভারতীয় আলঙ্কারিকদের স্মৃতিবহ। কিন্তু বঙ্কিম 'রস'-এর পারিভাষিক অর্থ-তাৎপর্যে অনুরাগী ছিলেন না। আমরা লক্ষ্য করব রসের সংজ্ঞার্থের পরিসীমা উপেক্ষা করেই উত্তরকালে 'রস' শব্দটি বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে এবং হচ্ছে এখনও। বঙ্কিমচন্দ্রও সেই ভাবেই শব্দটি গ্রহণ করেছেন। প্রথম উদ্ধৃতিটিতে কাব্য-সাহিত্যকে 'সৃষ্টি' বলে উল্লেখ করতে চেয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। সৃষ্টি এবং নির্মাণ গূঢ়ার্থে দুটি পৃথক শব্দ। নির্মাণ-এ কল্পনার লীলার পরিবর্তে পূর্বদৃষ্ট কোন কিছুর মাপে গঠন করা বুঝায়। আর 'সৃষ্টি' শব্দটি সৃজ ধাতু সম্পর্কিত। যদিও অভিধানে সৃষ্টির প্রতিশব্দ রূপে নির্মাণ শব্দের ব্যবহার মেলে কিন্তু 'নূতন কিছুর উৎপাদন'ও সৃষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যদিও নতুন উৎপাদন এবং নির্মাণ সমার্থক নয়। শব্দ দুটির অর্থপার্থক্যের দিকে উত্তরকালে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের মতে 'নির্মাণ' অর্থ কোন কিছুর মাপে গঠন করা আর 'সৃষ্টি' হল রূপদানের মুহূর্তে পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্জন। ইংরেজি প্রতিশব্দ ব্যবহার করলে 'নির্মাণ' হবে 'making' এবং 'সৃষ্টি' হবে 'creation'। Creation বা সৃষ্টিতে স্রষ্টার কল্পনাশক্তি এবং যাবতীয় স্বকীয়তাই প্রধান। এই সৃষ্টির তাৎপর্য বোঝাতে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহার করেছেন 'স্বভাবানুকারী', এবং 'সৌন্দর্যবিশিষ্ট' কথা দুটো। অন্যত্র আর একটু স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, সৃষ্টির মূল কথা 'স্বভাবানুকারিতা' এবং 'স্বভাবাতিরিক্ততা'। 'স্বভাবানুকারিতা' হল প্লেটো যাকে বলেছেন mimesis আর 'স্বভাবানুকারিতা' এবং স্বভাবাতিরিক্ততা' এই দুই মিলে যা হল তাকেই অ্যারিস্টটল বলেছেন 'mimesis'. যা ঘটেছে এবং যা ঘটা সম্ভব দুই মিলে 'সৃষ্টি'র পূর্ণতা। সুতরাং প্রথম সূত্রটিতে অ্যারিস্টটলীয় সিদ্ধান্তের সমর্থন আছে। দ্বিতীয় সূত্রে বঙ্কিম সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য রূপে গণ্য করেছেন 'সৌন্দর্যসৃষ্টি'কে। তরুণ রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন কবিদের কাজ শুধু সৌন্দর্য ফোটানো, অন্য কিছু নয়। উত্তরকালে তিনি আনন্দদানই কাজের উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করে অন্য সব কিছুকে গৌণ করেছিলেন। কিন্তু কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ছাড়াও বঙ্কিম আর একটি উদ্দেশ্যকেও মেনেছেন, যদিও তা গৌণ উদ্দেশ্য—'চিত্তোৎকর্ষ সাধন' 'চিত্তশুদ্ধিজনন'। এই উদ্দেশ্যকেই মুখ্য জ্ঞান করেছেন অ্যারিস্টটলের গুরু প্লেটো এবং সেই কারণেই বিশুদ্ধ আনন্দের পরিবেশক যাঁরা সেই কবিদের নির্বাসনে পাঠাতে চেয়েছিলেন পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে। তবে সৌজন্যের অভাব ছিল না তাঁর। বিদায় মুহূর্তে তিনি উক্ত আনন্দবাদীদের গলায় পড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন ফুলের মালা। বাঙলা সাহিত্যে

যিনি গঠনকার্যে ও নিবারণকার্যে সমর্পিত-চিত্ত ছিলেন সেই বঙ্কিম পাঠকের কামনা এবং সমাজ ও যুগের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই সম্ভবতঃ কাব্যের দ্বিবিধ উদ্দেশ্যকে মেনেছিলেন। প্লেটোর সংকীর্ণতা বঙ্কিমের ছিল না; হয়ত স্রষ্টার পক্ষে নিছক প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব নয় বলেই। 'উত্তরচরিত'-এর বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তৃত ব্যাখ্যার পথে না গিয়ে আভাসে সাহিত্য-তত্ত্বের এমন কিছু মৌলিক সূত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন যা ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে দীক্ষিতদের ছিল অজ্ঞাত এবং বাঙলা সাহিত্যতত্ত্বকে এনে দিয়েছিল য়ুরোপীয় নন্দনতত্ত্বের একেবারে নিকট সম্পর্কে।

'উত্তরচরিত' ছাড়াও 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' এবং 'গীতিকাব্য' প্রভৃতি প্রবন্ধেও বঙ্কিমের প্রতীচ্য শিক্ষা-প্রভাবিত সাহিত্য তাত্ত্বিক সত্তার পরিচয় মেলে। 'কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্যের হৃদয়' বঙ্কিমের এই মন্তব্যটি আছে তাঁর 'প্রকৃত এবং অতি-প্রকৃত' প্রবন্ধে। সাহিত্যে বহির্জগৎ এবং মানুষের আয়ত্তাতীত যে অতি-প্রাকৃত জগৎ সবই আশ্রয় পেয়ে থাকে। কিন্তু সাহিত্যের মুখ্য অবলম্বন কী? দীর্ঘকাল আগে অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে ট্রাজেডি তত্ত্বের আলোচনায় বলেছিলেন যে, ট্রাজেডি হল পূর্বা-পর সঙ্গতি রক্ষা করে 'human action'-এর অনুকরণ। 'অনুকরণ' মানে বস্তুর যথাযথ উপস্থাপনা নয়। শৈল্পিক সম্ভাব্যতা অক্ষুণ্ণ রেখে আদি-মধ্য-অন্তের সমন্বয়ের দ্বারা, যা ঘটেছে তা নয় যা ঘটতে পারে তারই রূপায়ণ হল 'মাইমেসিস'। অ্যারিস্টটলের অন্যতম ভাষ্যকার এস এইচ· বুচার বলেছেন, অ্যারিস্টটল মানবজীবন অনুকরণের কথা বলেছিলেন এবং বহির্জগৎকে দিয়েছিলেন পশ্চাৎপটের ভূমিকা। ওয়ার্ডস্বার্থের মুখে কবিতার আলোচনায় শোনা গিয়েছিল—কবিতা হল মানুষে-মানুষে আলাপ, একের কাছে অপরের কথা। ভরতাচার্যের 'নাট্য লোকবৃত্তানুকরণম্'-এর সঙ্গে অ্যারিস্টটল বা ওয়ার্ডস্বার্থের মন্তব্যের তত্ত্বগত অমিল নেই। বঙ্কিমও কাব্যরসের সামগ্রী রূপে মনুষ্য হৃদয়কে গণ্য করা ছাড়াও 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' প্রবন্ধে বলেছেন, 'যাহা মনুষ্যহৃদয়ের অংশ অথবা যাহা তাহার সঞ্চালক, তদ্ব্যতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে'; এবং অতিমানুষের বর্ণনা যদি থাকে তাহ'লে বুঝতে হবে সে সবই 'মনুষ্যচরিত্রচিত্রের আনুষঙ্গিক মাত্র। বস্তুতঃ এখানে ভরত অথবা অ্যারিস্টটল প্রমুখের যে মন্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায় তা উত্তরকালে রবীন্দ্ররচনায় বারবার মিলেছে। মানুষই যে কাব্য-সাহিত্যের কেন্দ্রে এবং মানুষের কথাই সাহিত্যে কাম্য; অধিকাংশ ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা কেন যে সে সত্য বিস্মৃত হয়ে শব্দার্থের দেহ থেকে রসের আলোচনায় অথবা অন্য জটিলতর প্রসঙ্গে নানা তর্ক-বিতর্ক করেছেন, বিস্ময় সেখানেই। প্রসঙ্গটা ভরত ছুঁয়েছিলেন তাঁর নাট্যশাস্ত্রে' এবং 'দশ-রূপক'-এ ধনঞ্জয়। আর কেউ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও তেমন গুরুত্ব দেন নি। 'মনুষ্যহৃদয়' 'মনুষ্যচরিত্র' এই জাতীয় উক্তি বঙ্কিমে আরও বেশ কয়েকবার লক্ষ্য করা যায়। ১২৮০'র পৌষে 'মানস বিকাশ'-এর আলোচনা কালে বঙ্কিম লিখেছিলেন, 'কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়।' ১২৮১র পৌষমাসে প্রকাশিত হয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ে 'কল্পতরু'র সমালোচনা। সেখানে বঙ্কিম বলেছেন, 'কাব্যের বিষয় মনুষ্য চরিত্র'। সুতরাং সাহিত্যের বিষয় সম্পর্কে বঙ্কিমের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত স্পষ্ট এবং বারংবার প্রায় সদৃশ উক্তি উচ্চারণের দ্বারা সেই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত।

'গীতিকাব্য' ( ১২৮০ বৈশাখ ) প্রবন্ধটি 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' প্রবন্ধের পূর্বে প্রকাশিত। এই রচনায় বঙ্কিম প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকদের পন্থায় কাব্যকে তিনভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন : দৃশ্যকাব্য, আখ্যানকাব্য ও খণ্ডকাব্য। 'গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য'—গীতিকাব্যের এই পরিচয়-জ্ঞাপক সংজ্ঞাদানের পর বঙ্কিম বললেন, 'অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যেকাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য।' উদ্ধৃতিটির প্রথম অংশে গীতিকাব্যের উৎপত্তির দিকে এবং দ্বিতীয়াংশে কবির অন্তরানুভূতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। বঙ্কিম এখানে স্পষ্টই পাশ্চাত্ত্যপন্থানুসারী। পাশ্চাত্ত্যে Lyric শব্দটি এসেছে Lyre থেকে। প্রথমে বীণা সংযোগে গান গেয়ে গীতিকবিতা পরিবেশন করা হত। পরে Lyric ছিন্ন করে তার উৎসের সঙ্গে যোগসূত্র। বঙ্কিম বললেন, গীতিকবিতা হল বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন। কিন্তু উচ্ছ্বাসের স্ফুটনই কাব্য বা গীতিকাব্য কি ? তাহ'লে ওয়ার্ডস্বার্থ কেন অকারণে বলবেন কবিতার জন্ম 'নিস্তাপ স্মৃতির অন্তর রোমন্থন থেকে' ? 'Tranquility'-এবং 'recollect' কোন শব্দটিই অকারণে ব্যবহৃত নয়। 'Powerful emotion' এর 'Spontaneous overflow' বা স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস তখনই গীতিকাব্যের মহিমাভিষিক্ত হতে পারে যখন তা (tranquility) নিস্তাপ হয়ে আসে এবং অনুভূতির রোমন্থন-ক্রিয়া অব্যাহত থাকে। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের প্রকাশই গীতিকাব্য—একথা বললে গীতিকাব্য কাব্যরূপে গৌণ হয়ে পড়ে, কারণ উচ্ছ্বাস কদাপি কবিতা নয়। বঙ্কিমের ব্যাখ্যানুযায়ী, বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের বৈষ্ণবপদ, ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী', মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা', হেমচন্দ্রের কবিতাবলী সবই উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ রঞ্জিনী'ও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই প্রবন্ধ রচনার কালে 'রবীন্দ্রঠাকুরের কাব্য সকল প্রকাশিত হয় নাই'। হলে নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাব্যগুলিকে পূর্বোক্ত কাব্যসমূহের সমশ্রেণীভুক্ত করতেন। এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে বঙ্কিম একই সংজ্ঞার সীমায় বৈষ্ণব পদ সাহিত্য থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্য কবিতাকে আনতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু গীত হওয়াই গীতিকাব্যের উদ্দেশ্য —এই সূত্রানুসারে বৈষ্ণব পদাবলী গীতিকাব্য হতে পারে আর বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতাই গীতিকাব্য, এই সংজ্ঞানুযায়ী মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যগুলিকে গীতিকাব্য বলা সংগত। বৈষ্ণব পদ সাহিত্যে গানের প্রাধান্য কিন্তু আধুনিক কাব্য-কবিতা অবশ্যই তা নয়। প্রাচীন ও আধুনিক গীতিকাব্যের এই পার্থক্যটুকু স্পষ্ট না করলে মধু-হেম-নবীনের গীতিকবিতার আধুনিকত্ব এবং অন্যান্য গীতিকাব্যিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে না।

'গীতিকাব্য' প্রবন্ধের আর একটি প্রধান তত্ত্বসূত্র হল গীতিকাব্যের সঙ্গে নাটকের পার্থক্য। স্নেহ, শোক, ভয় ইত্যাদি নানা অনুভূতির দ্বারা আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন থাকে। তার কতকটা ব্যক্ত হয় কতকটা থাকে অব্যক্ত। যা ব্যক্ত হয় তা ক্রিয়া ( action ) বা কথার দ্বারা হয়। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাট্যকারের সামগ্রী। আর যেটুকু অব্যক্ত থাকে তা গীতিকবির অধিকারভুক্ত। পুনরায় বললেন, নাটক হল পরচিত্ত সম্বন্ধীয় এবং কাব্য হল 'আত্মচিত্ত-সম্বন্ধীয়'। এমন কথা নাটকে থাকতে পারে না যা 'আত্মচিত্ত-

সম্বন্ধীয় এবং অব্যক্তব্য'। বঙ্কিম নাটক সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাতে ভবভূতির 'উত্তর রাম-চরিত' এবং শেকসপীয়রের 'ওথেলো'র শ্বারস্থ হয়েছিলেন, হয়ত বাঙলায় নাটক তখনও সেভাবে গড়ে ওঠে নি বলে। তবে সন্দেহ নেই, নাটক সম্পর্কে মধুসূদনের চিঠিপত্র অনেক বেশী বাস্তবানুগ এবং অভিজ্ঞতা-নির্ভর। বঙ্কিমের রচনায় নৈয়ায়িকের পরিমিতিবোধ ছিল, কবি-শোভন ভাবাবেগ ছিল, নাটকীয় আকস্মিকতা-বিশিষ্ট কাহিনী ছিল। কিন্তু 'সংবাদ প্রভাকর'-এর বঙ্কিম কবি থেকে নতুন রূপে এসেছিলেন উপন্যাসের জগতে। তাঁর রচনা নাটকীয় গুণ-বিশিষ্ট হলেও নাট্যকারের অভিজ্ঞতা না থাকায় নাট্যতত্ত্বালোচনায় তিনি মধুসূদনকে স্পর্শ করতে পারেন নি।

'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দৃশ্যকাব্য ও আখ্যানকাব্যের সঙ্গে গীতিকাব্যের পার্থক্য আলোচনা করেছিলেন। সেই আলোচনার সিদ্ধান্ত তর্কাতীত সত্য না হলেও বাঙলায় প্রাক-রবীন্দ্র পর্বে গীতিকাব্যের আলোচনা হিসেবে তার গুরুত্ব অবশ্য মান্য। সংক্ষিপ্ত পরিসরের এই আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র একই সঙ্গে সূক্ষ্মতা ও পরিমিতি জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধটি শুরু করলেন এইভাবে. 'বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই'। অত্যন্ত সতর্ক ও শব্দ ব্যবহারে মিতব্যয়ী বঙ্কিম যখন এইভাবে শুরু করেন, তখন মনে হয় জয়দেব এবং বিদ্যাপতিকে অবলম্বন করে কার্যতঃ গীতিকাব্য সম্পর্কে আলোচনাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' ও 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধ দুটির তুলনায় এই প্রবন্ধের আকার বৃহৎ এবং এর বক্তব্যের মধ্যেও সাহিত্য-তত্ত্বের একাধিক সূত্র বর্তমান। সবচেয়ে উল্লেখ্য এবং চাঞ্চল্যকর সূত্রটি মার্কসীয় তত্ত্বে দীক্ষিতের কাছেও গ্রাহ্য : 'সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল।' দেশ ভেদে, দেশের অবস্থা ভেদে সাহিত্যের পরিবর্ত্তন ঘটে। তবে যে সব নিয়মের ফলে সাহিত্যের পরিবর্তন ঘটে তা যেমন জটিল তেমনি দুর্জ্ঞেয়। কোঁৎ-এর ধ্রুববাদী তত্ত্বের অনুরূপ কোন তত্ত্বের নিরিখে সাহিত্যের বিচার সম্ভব নয়। বঙ্কিম মনে করেন একমাত্র পাশ্চাত্ত্য হিতবাদী দার্শনিক বক্‌ল ছাড়া অন্য কেউ এ ব্যাপারে তেমন চেষ্টা করেন নি। কিন্তু তিনি ছিলেন মুখ্যতঃ সমাজ তত্ত্বের আলোচক সুতরাং সাহিত্য সম্পর্কে এই ধরনের আলোচনা বিশেষ কেউ করেন নি। সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ম্যাক্সমুলারও নন। বঙ্কিমচন্দ্র হিতবাদীদের কথা স্মরণ করেছেন, স্মরণ করেছেন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতদের। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের মধ্যে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল কার্ল মার্কস-এর। মার্কস তাঁর 'বেস' এবং 'সুপার স্ট্রাকচার'-এর সম্পর্ক আলোচনা তখন শেষ করেছেন। পরের দুই দশকের মধ্যে এই সম্পর্কের তাত্ত্বিক অপপ্রয়োগ ঘটেছে এবং কিছুকাল পরে এঙ্গেলস নিজেকে এবং মার্কসকে এই অপচেষ্টার জন্য অংশতঃ দায়ী করে আত্মসমালোচনাও করেছেন। বঙ্কিম এই তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। বস্তুতঃ পাশ্চাত্যের হিতবাদী দর্শনই বঙ্কিমের কাছে তখন আদর্শ স্বরূপ। অধিক সংখ্যক মানুষের পরম উপকার সাধন—তখন 'উদারনৈতিক দর্শন হিসেবে আকৃষ্ট করেছে সেই বঙ্কিমকে যিনি 'বিষবৃক্ষ' লিখে ঘরে ঘরে অমৃতফল লাভের প্রত্যাশী হয়েছিলেন এবং চন্দ্রশেখর-এর শৈবলিনী-কে বলেছিলেন 'পাপীয়সী' 'পাপিষ্ঠা' ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্র অর্থনীতিকে ভিত্তিরূপে গণ্য করেন নি। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা-পারম্পর্যের দিকে

লক্ষ্য রেখে ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক আলোচনা করেছিলেন। সাহিত্য বিচারে যাঁরা তেইন-এর 'Race', Milieu' এবং 'Moment' এই তিন তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন বঙ্কিমের মন্তব্যে তাঁদের উক্তির সাদৃশ্য চোখে পড়ে। কিন্তু এই প্রবন্ধে জয়দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে তিনি এক সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা কালে বিদ্যাপতিকেও বাঙালী রূপে গণ্য করে ইতিহাসের কিঞ্চিৎ বিকৃতি ঘটিয়েছেন। তবে প্রবন্ধটি অবশ্যই Comparative criticism-এর দিকে বঙ্কিমের আগ্রহ প্রমাণ করে। বাঙলায় এই পদ্ধতির তিনিই প্রবর্তক। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধটির আর এক আকর্ষণ কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে মেকলে'র উক্তির প্রতি বঙ্কিমের সমর্থন, যে উক্তি পরে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য ও সভ্যতা' প্রবন্ধে সমালোচনা করেছিলেন। মেকলে বলেছিলেন 'As civilisation advances poetry does necessarily decline'। বঙ্কিম বললেন, ইংরেজী সাহিত্য প্রভাবিত বাঙলা গীতি কবিতার বিষয়গত বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেলেও অনুভূতির গাঢ়তা হ্রাস পেয়েছে, 'জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব শক্তির হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ'। মেকলে-কে শুধু সমর্থন নয়, নিজেও উপমা টেনে বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করলেন।

কাব্যের উদ্দেশ্য কী? 'উত্তর চরিত'-এ বঙ্কিম বললেন, 'অতএব সৌন্দর্য সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য'। আর 'গৌণ উদ্দেশ্য' হল 'চিত্তোৎকর্ষ সাধন,' 'চিত্তশুদ্ধিজনন'। গঙ্গাচরণ সরকারের 'ঋতুবর্ণন'-এর সমালোচনায় বঙ্কিম পুনরায় বললেন, 'কাব্যের দুইটি উদ্দেশ্য: বর্ণন ও শোধন'। 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন' শীর্ষক প্রতিবেদনে সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য বলতে আবার বললেন, 'লিখে যদি দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন তবে অবশ্য লিখিবেন'। এ ছাড়া 'সত্য', 'ধর্ম' প্রভৃতি শব্দগুলি তাঁকে অনেকবার ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। সুতরাং 'শোভন', 'শুদ্ধি' এবং সেই সঙ্গে যুক্ত 'ধর্ম' শব্দটি বঙ্কিমের সাহিত্যতত্ত্বে এমন গুরুত্ব পেয়েছিল যা প্রাচীন গ্রীসের প্লেটো-র তত্ত্ব মনে করিয়ে দেয় অথবা ভিক্টোরিয় রাস্কিনের কথা। রসসাহিত্য সৃষ্টিতেও বঙ্কিম সম্ভবতঃ সাহিত্যের এই মৌলিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি। উত্তরকালের বঙ্কিমই শুধু 'মরালিস্ট' ছিলেন না, মিল-বেন্হামের পাঠক বঙ্কিম 'উত্তর চরিত'-এ 'রসোদ্ভাবন' শব্দটি ব্যবহার করলেও নিছক আনন্দকে সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলে মেনে নিতে পারেন নি কোনদিন। তবে বঙ্কিম 'সাহিত্য' এবং 'এথিক্স'কে সমীকৃত না করেই তাঁর নান্দনিক সিদ্ধান্ত এই ভাষায় জানালেন, 'নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য'। বঙ্কিম-কথিত 'চিত্তশুদ্ধি বা 'শোধন' কি বেন্হাম কথিত Purity-সদৃশ যার সঙ্গে 'goodness' বা 'মঙ্গল এবং 'Pleasure' বা সুখ জড়িত? নাট্যকার মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় Social reality থাকলেও তাত্ত্বিক মধুসূদন সাহিত্যের সামাজিক মূল্য সম্পর্কে তেমন করে ভাবেন নি। ঔপন্যাসিক বঙ্কিম কবি মধুসূদনের প্রতি অনুকূল ছিলেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের নব অভ্যুত্থানের সঙ্গে তাঁর সামাজিক ও শিল্পী-বিবেকের মেল বন্ধন হওয়ায় বঙ্কিম সাহিত্যে শুধুমাত্র Social Reality কে তুলে ধরেন নি, সাহিত্যের Social এবং Ethical মূল্যমানের উপরেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আনন্দবাদী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এ ব্যাপারে পার্থক্য ছিল একান্তই মৌলিক।

৩

# রবীন্দ্রনাথ

১২৮৩ বঙ্গাব্দে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা', 'অবসর সরোজিনী' ও 'দুঃখসঙ্গিনী' প্রভৃতি তিনখানি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনার দ্বারা যখন রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-বিচারের আসরে অবতীর্ণ হলেন তখন বাঙলা সাহিত্যে অবলম্বিত যে পদ্ধতির সাক্ষাৎ পেলেন তা একেবারেই দেশজ নয়; শুধু 'রস' শব্দটি রয়ে গিয়েছে বিলীয়মান পণ্ডিতি পদ্ধতির শেষ স্মৃতিচিহ্নরূপে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই বিশেষ শব্দটির গুরুত্ব শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে গিয়েছেন, যদিও (বঙ্কিমের মতই) পারিভাষিক অর্থ-তাৎপর্যে নয়। মৃত্যুর বছর পাঁচেক আগে (১৩৪৩, ৮ই আশ্বিন) অনুজ কবি-বন্ধু অমিয়চন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ জানালেন: 'সৌন্দর্য প্রকাশই সাহিত্যের বা আর্টের মুখ্য লক্ষ্য নয়। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে অলংকারশাস্ত্রে চরম কথা বলা হয়েছে: বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।' এই 'রস' শব্দটির ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন ১৩১৩-তে ('সাহিত্য সম্মিলন' প্রবন্ধে): 'যাহা হৃদয়ের কাছে কোনো না কোনোভাবে প্রকাশ পায় তাহাই রস—শুধুমাত্র জ্ঞানের কাছে যাহা প্রকাশ পায় তাহা রস নহে।' এবং 'যে রস মানুষের প্রয়োজন মাত্রকে অতিক্রম করিয়া বাহিরের দিকে ধাবিত হয় তাহাই সাহিত্যরস।' রসের এই ব্যাখ্যা যে ভরত অভিনবগুপ্ত বা অন্য কোন আলংকারিকদের পশ্চানুবর্তী নয় তা স্পষ্ট। এই ব্যাখ্যা বরং কান্ট, শিলার বা স্পেন্সর-এর কোন মতের সঙ্গে মিলতে পারে। ভারতীয় অলংকারিকেরা নিশ্চয়ই 'মানবরস' 'সমগ্ররস' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন নি। 'জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ'-এ পঠিত 'সৌন্দর্যবোধ' (১৩১৩ পৌষ। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত) প্রবন্ধের শেষ কথাগুলি ছিল, 'সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে: রসো বৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। তিনিই রস; এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়।' সুতরাং আলংকারিক পন্থা বর্জন করেই রবীন্দ্রনাথ 'রস' শব্দটি গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করেছেন এবং স্মরণ করেছেন উপনিষদের মন্ত্রের সঙ্গে ইংরেজ কবি জন কীটস-এর উক্তি। কীটস-এর 'Beauty is truth, truth beauty' একটু এদিক ওদিক করে নিয়ে তিনি বহুবার ব্যবহার করেছেন। ১৮৯৫-এর ১৪ই ডিসেম্বর একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'আমি যত ইংরাজ কবি জানি সব চেয়ে কীটসের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আমি বেশি করে অনুভব করি।' কীটস-এর প্রতি তাঁর এই অনুরাগ তথা আত্মীয়তাবোধ 'অক্ষুণ্ণ' ছিল শেষ পর্যন্ত। এমন কি ১৯২৬-এর Villeneuve-তে রোমাঁ রল্যাঁ-এর সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয়েছিল তখন রবীন্দ্রনাথ কীটসকে স্মরণ করেছিলেন কথা প্রসঙ্গে। জীবনের প্রথম দিকে ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয়টা ছিল সর্বাধিক। এই সময়কার ('আলোচনা') দু'একটি মন্তব্যে যেমন: (ক) 'সৌন্দর্য প্রেম জাগায় এবং প্রেম সৌন্দর্য জাগাইয়া তুলেছে।' (খ) 'প্রেম যেখানে ভাব, সৌন্দর্য সেখানে তাহার অঙ্কুর; নিও-প্লেটোনিকদের 'Love regards as its end the enjoyment of beauty' (ফিশিনো) 'when we say Love, we mean by that term the desire for beauty' (ঐ) প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কিন্তু সৌন্দর্য ও প্রেমের এই আত্মীয়তা স্বীকারে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বগত ভাবে যদিও নিও-প্লেটোনিকদের কাছের মানুষ, তথাপি এই নৈকট্য, মনে হয়, সম্ভব হয়েছিল ইংরেজ রোমান্টিকদের বিশেষতঃ কীটস ও শেলীর কাব্যপাঠের ফলে।

মাত্র পনেরো বছর বয়সে 'জ্ঞানাঙ্কুর প্রতিবিম্ব'-এ 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' প্রভৃতি তিনখানি কাব্যগ্রন্থের যে সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, সে বিষয়ে পরে 'জীবনস্মৃতি'তে ঠাট্টা করে লেখেন, 'খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম খণ্ড কাব্যেরই বা লক্ষণ কী, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, তাহা অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম'। সেই আলোচনায় বিচক্ষণতার ছাপ থাক বা না-থাক এই প্রবন্ধে গীতিকাব্যের স্বরূপ বিচারে রবীন্দ্রনাথ যে পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি অনুসারী তাতে সন্দেহ নেই। লিখছেন, 'ইংরাজীতে যাহাদিগকে Odes, Sonnets প্রভৃতি কহে তাহাদিগের সমষ্টিকেই আমরা গীতিকাব্য বলিতেছি।' অর্থাৎ আলোচনার পথ তৈরি হয় পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা শাস্ত্রানুযায়ী। এরপর 'ভারতী'তে 'মেঘনাদ বধ' কাব্যালোচনা কালে তিনি 'ট্রাজেডি'র স্বরূপ যেভাবে আলোচনা করেন তা অ্যারিস্টটলীয় নয় ঠিকই কিন্তু 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশের পূর্বেই যে পাশ্চাত্ত্যরীতি অনুসরণ করে তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ গড়ে উঠেছিলেন তাতে সংশয় নেই। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত কাব্য চতুষ্টয়ের নামে সংগীত কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত হয়ে আছে। 'সন্ধ্যাসংগীত' প্রকাশের আগেই 'সংগীত' ও 'ভাব' এবং হার্বার্ট স্পেন্সরের 'The origin and function of music' এর অনুবাদ 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' এবং 'সংগীত ও কবিতা' প্রকাশিত হয়। তারপর হৃদয়-অরণ্যে পরিভ্রমণের কালেই অস্ফুট কলগীতি যখন কবিতায় রূপ নিচ্ছিল তখন সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেয়ে সুস্পষ্ট কোনও তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের দিকেই কবি অগ্রসর হচ্ছিলেন। 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি', 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা' এবং 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন' এই সময়কার রচনা। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'কল্পনারও শিক্ষা আবশ্যক করে। যাহাদের কল্পনা শিক্ষিত নহে, তাহারা অতিশয় অসম্ভব অলৌকিক কল্পনা করিতে ভালবাসে।' পরে ১৩০১-এর 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে ('সাধনা'য় প্রকাশিত) শিক্ষিত কল্পনাকে 'কল্পনা' এবং অসম্ভব অলৌকিক কল্পনা যা অসংগতরূপে স্ফীতকায় তাকে বলেছিলেন 'কাল্পনিকতা' যার ইংরেজী প্রতিশব্দ হতে পারে যথাক্রমে 'Imagination' ও 'Fancy'। এ বিষয়ে তাঁর আলোচনায় কোলরিজের বিস্তার না এলেও কোলরিজ এবং শেলি'র সঙ্গে তাঁর মতৈক্য ধরা পড়ল, অবশ্য ওয়ার্ডস্বার্থের সংগে নয়। ওয়ার্ডস্বার্থ 'Imagination' ও 'Fancy'র মধ্যে শ্রেণীগত নয়, মাত্রাগত পার্থক্যই শুধু লক্ষ্য করেছিলেন। 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা' এবং কিছু পরের 'সাহিত্য ও সভ্যতা'য় ধরা পড়ল মেকলের সংগে রবীন্দ্রনাথের মতানৈক্য ও ম্যাথু আর্নল্ডের সংগে ঐক্য। সভ্যতা ও কবিতায় খাদক-খাদ্যের সম্পর্ক দেখেছিলেন মেকলে —একের উন্নতিতে অপরের অধঃপতন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'সভ্যতার সমস্ত অংগে যেরূপ পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে কবিতার অংগও সেইরূপ পরিবর্তন হইবে ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়' (বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা) এবং 'যাহাকে সাহিত্য নাম দেওয়া যাইতে পারে তাহা উদ্যমপূর্ণ সজীব সভ্যতার সহিত সংলগ্ন, স্বাস্থ্যময়, সৌন্দর্যময়, আনন্দময় 'অবসর' এবং 'সভ্যতার শাসন নিয়ম, সভ্যতার কৃত্রিম শৃংখলা যতই আঁট হয়—হৃদয়ে হৃদয়ে স্বাধীন মিলন, প্রকৃতির অনন্ত ক্ষেত্রের মধ্যে কিছুকালের জন্য রুদ্ধ হৃদয়ের ছুটি, ততই নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠে। সাহিত্যই সেই মিলনের

স্থান, সেই খেলার গৃহ, সেই শান্তিনিকেতন। সাহিত্যই মানব হৃদয়ে সেই ধ্রুব অসীমের বিকাশ' ('সাহিত্য ও সভ্যতা')। এই সব মন্তব্যের সঙ্গে এবং দ্বিতীয়োক্ত প্রবন্ধটির সমকালে লেখা 'আলস্য ও সাহিত্য' প্রবন্ধে ব্যক্ত অভিমতের সঙ্গে অ্যারিস্টটলের *Nicomachean Ethics*-র 'leisure' তত্ত্বের যেমন মিল আছে তেমনি মিল আছে ম্যাথ্যু আর্নল্ডের এই উক্তির সঙ্গে :

> **The future of poetry is immense, because in poetry, where it is worthy of its high destinies, our destinies, our race, as time goes on will find an ever and ever surer stay...More and more mankind will discover that we have to turn to poetry to interpret life to us, to console us, to sustain us. Without poetry, our science will appear incomplete**[১]

রবীন্দ্রনাথ অ্যারিস্টটলের 'Nicomachean Ethics'-এর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা জানি না, তবে অবশ্যই আর্নল্ডের রচনার সঙ্গে যে পরিচিত ছিলেন সে বিষয়ে অন্ততঃ তিনটে প্রমাণ উদ্ধার করা যেতে পারে :

১. ১২৮৮-এর অগ্রহায়ণের 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথ যে 'অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরাজ কবি' প্রবন্ধটি লেখেন সেখানে ইংলন্ডের যে ক'জনের উপর অদ্বৈতবাদের প্রভাব আলোচিত হয়, আর্নল্ড তাঁদের অন্যতম।

২. ১৩০৮-এর বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের 'জুবেয়ার' প্রবন্ধটির আদর্শ ছিল আর্নল্ডের ঐ নামের প্রবন্ধ।

৩ *Essays in Criticism*-এর দুটি সিরিজের অন্ততঃ চারটি প্রবন্ধে—যাদের রচনা কাল ১৮৬৪-'৮১—আর্নল্ড কাব্য-কবিতাকে 'Criticism of life' বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধে (১৩০১) লিখেছেন : 'সাহিত্যের সমালোচনাকেই সমালোচনা বলা হইয়া থাকে, কিন্তু অধিকাংশ সাহিত্যই প্রকৃতি ও মানব জীবনের সমালোচনামাত্র।' রবীন্দ্র-কথিত সমালোচনা এবং আর্নল্ড-কথিত 'Criticism' দোষ গুণের সন্ধান অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। Criticism কথাটি আর্নল্ড ব্যবহার করেছিলেন 'by the laws of poetic truth and poetic beauty' অর্থে আর রবীন্দ্রনাথ বললেন, সমালোচনার অর্থ অন্য সব কিছু উপলক্ষ করে মানুষকে প্রকাশ করা। 'সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ'(সাহিত্যের প্রাণ: ১২৯৯ সাধনা) এবং 'সাহিত্যের বিষয় মানব হৃদয় ও মানব চরিত্র' (সাহিত্যের তাৎপর্য-১৩১০ বঙ্গদর্শন) প্রভৃতি উক্তির সঙ্গে 'মানব জীবনের সমালোচনামাত্র'—এই মন্তব্যের কোন বিরোধ নেই। আর্নল্ড ছাড়া ভিক্টোরীয় যুগের কার্লাইল ও রাস্কিনের উল্লেখ মেলে তাঁর লেখায়। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে রাস্কিনের চিন্তার প্রতি কবি আকৃষ্ট হন এক সময়।

১. *Essays in Criticism*, Series I, pp 1-2

১৯০০-এর ২০শে জুন প্রিয়নাথ সেন-কে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'প্রদীপে রাস্কিনের সমালোচনা উপলক্ষে কাব্য এবং নীতি সম্বন্ধে যা লিখেছ আমি তা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।' অবশ্য তিনি মনে করেন, আকৃতি-প্রকৃতি-আচরণের সৌন্দর্য সবই ললিত কলার অধিকার ভুক্ত; কিন্তু 'সৌন্দর্যের হিসাবে না গিয়ে কোন প্রকার নৈতিক আবশ্যকতা, সামাজিক উপযোগিতার হিসাবে গেলেই আর্টের লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হয়'। ২১শে সেপ্টেম্বর আর একখানি চিঠিতে লেখেন, 'তোমার রাস্কিন প্রবন্ধে ত দেখিয়েছ যে সৌন্দর্য বোধের সঙ্গে যখন ধর্মবোধের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তখন সৌন্দর্যভোগকে অবসর নিতে হয়'। স্মরণ করা যেতে পারে ১৩০৭-এর পৌষ সংখ্যার বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত হয় 'কুমার-সম্ভব' ও 'শকুন্তলা' প্রবন্ধটি। ঐ বছর 'নৈবেদ্য' কাব্য গ্রন্থের প্রকাশ এবং ১৩০৮-এর বৈশাখ থেকে ১৩০৯-এর কার্তিক পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'চোখের বালি' উপন্যাস। ধর্মনীতির সৌন্দর্য সাহিত্যের এক্তিয়ারভুক্ত কি না, প্রেম-নীতি-সৌন্দর্যের সম্পর্ক কী, সম্ভবতঃ এই সব প্রশ্নে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তখন বিচলিত রাস্কিনের প্রভাবেই। 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা'য় রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে 'রবীন্দ্র জীবনী'-কার প্রভাতকুমার লিখেছেন, 'Aesthetics ছাপাইয়া এখন Ethics সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে।'[২] প্রভাতকুমারের মতে 'কুমার-সম্ভব ও শকুন্তলা' তাত্ত্বিক সমালোচনা বলে কবির রসবিদগ্ধ চিত্ত তৃপ্ত হল না, তিনি শকুন্তলা'র একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখলেন। এই সমালোচনা যথার্থ সাহিত্য সমালোচনা'।[৩] কেন 'শকুন্তলা' প্রবন্ধটি যথার্থ সাহিত্য সমালোচনা তা ব্যাখ্যা করেন নি প্রভাতকুমার। প্রবন্ধটির এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সৌন্দর্য প্রেম ও মঙ্গলের দ্বারা পাপকে ভিতর থেকে বিলুপ্ত করার আকাঙ্ক্ষাই আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষার প্রকাশই 'সাহিত্য': 'সাহিত্য সেই লক্ষ্য সাধনের নিগূঢ় প্রয়াসকে ব্যক্ত করিয়া থাকে। সে ভালোকে সুন্দর, সে শ্রেয়কে প্রিয় সে পুণ্যকে হৃদয়ের ধন করিয়া তোলে'। লক্ষ্য করা যায়, সাহিত্যের জগতে রবীন্দ্রনাথ মানুষের মূল্যবোধের অন্যতম রূপ 'Ethics'কে 'Aesthetics'এর সঙ্গে মিশিয়ে তবেই গ্রহণ করেছেন। কারণটি অবশ্য 'প্রদীপ'-এ প্রকাশিত প্রিয়নাথ সেনের রাস্কিন-সংক্রান্ত রচনাটি। রাস্কিনের *Modern Painters*-এর প্রথম খণ্ড লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়-১৮৯৮এ। প্রিয়নাথ সেনের উক্ত প্রবন্ধটি ছাড়া রাস্কিনের *Modern Painters* রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন তার কোন প্রমাণ হাতে নেই। সুতরাং সমকালীন সাহিত্যে ও সমালোচনায় রাস্কিনের প্রভাব থাকলে তা ছিল একান্তই পরোক্ষ। দ্বিতীয় কারণ তলস্তয়ের *What is Art ?* এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ। যে তলস্তয়ের আনা কারেনিনা 'ছিন্ন পত্রাবলী'র রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয় নি, সেই তলস্তয়ের *What is Art ?* এর প্রকাশ ১৮৯৮-এ এবং Aylmer Maude-এর অনুবাদ ১৯০০-তেই রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে পড়ে। এই সময়কার একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

২. রবীন্দ্র জীবনী ২য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ দ্রষ্টব্য

৩. ঐ

'সকালবেলায় Tolstoy'র বইখানা দেখছিলুম। ওর সংগে মিলিনে কিন্তু খুব Suggestive' এবং 'আমার ইচ্ছে করে ওর বিস্তৃত সমালোচনা করে একটি বড়ো প্রবন্ধ লিখি—তার মধ্যে আমার মতটা বিস্তৃত করে বলতে পারি' ( চিঠিপত্র : ৮ ; ১৯০০ এর ৯ই অক্টোবর )।

যে কারণে রাস্কিনের কথাটা আবেদন করেছে, সেই কারণেই তলস্তয়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিরাগ। কারণটা হল, 'এথিক্স' এবং 'এসথিটিক্স'-এর পুরোনো দ্বন্দ্ব। ধর্মনীতির সৌন্দর্যও রাস্কিনের কাছে সৌন্দর্যের মর্যাদা পেয়েছিল, কিন্তু তলস্তয় বলেছিলেন, সৌন্দর্যবোধের মূলে আছে বাসনার তাড়না আর বাসনাকে জয় করতে পারলে তবেই মংগলের সম্ভাবনা। তলস্তয়ের সংগে আরও নানা ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ হয়ত এক হতে পারেন নি, কিন্তু তলস্তয়ের 'সঞ্চারতত্ত্ব' তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করতে হয়, ভাবের কথাকে সঞ্চারিত করে দিতে হয়—রবীন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্ত তলস্তয়-এর Communication তত্ত্ব মনে করিয়ে দেয়।[৪] তলস্তয়ের সংগে রবীন্দ্রনাথ অনেকদূর পর্যন্ত চলতে পারেন নি; রাস্কিনের সংগও পেয়েছেন কি ? অন্ততঃ রাস্কিনের এই উক্তিটির সংগে রবীন্দ্রনাথের মতভেদ ছিল অনিবার্য :

> The picture which has the nobler and more numerous ideas however awkwardly expressed, is a greater and a better picture than that which has the less noble and less numerous ideas, however beautifully expressed.[৫]

সৌন্দর্যের বিচার বাদ দিয়ে সামাজিক উপযোগিতার দিকে গেলে আর্টকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হয় এই বিশ্বাসে যিনি স্থির তাঁর পক্ষে রাস্কিনের এই অভিমত মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। নইলে কেন ১৩০৯-এর আশ্বিনে লিখলেন, 'বাজে কথা' ? রাস্কিন যেখানে রূপকে গৌণ করে মহৎ ভাবাদর্শকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোন বিশেষ কথা বলিবার স্পর্ধা রাখে না'। 'যথার্থ বাজে রচনা' বলতে রবীন্দ্রনাথ উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ রচনা বুঝিয়েছেন। এই রচনার সংগে অস্কার ওয়াইল্ডের *Intention*-এর 'The decay of lying' প্রবন্ধের এই পঙক্তিগুলি নিশ্চয়ই মিলিয়ে নেওয়া যায় :

> As long as a thing is useful or necessary to us, or affects us in any way, either for pain or pleasure...it is outside the proper sphere of art.

৪. To evoke in oneself a feeling one has once experienced and having evoked it in one self then by means of movements, lines, colours, sounds, or forms expressed in words, so to transmit that feeling that others experience the same feeling—this is the activity of art. ( *What is Art ?* Oxford. P 123 )

৫. *Modern Painters*, Part I, Section I.

কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথের উপর অস্কার ওয়াইল্ডের প্রভাব স্পষ্ট নাও থাকতে পারে, যদিও *Intention* ১৮৯১-এ প্রকাশিত হয়ে তখন রবীন্দ্রনাথের হাতে পৌঁছনো সম্ভব তবে অনুরূপ কথা বের্গস°-র 'Laugther'-এও পাওয়া যায়।[৬] মনে হয়, রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের চিত্তবিকাশের মুহূর্তে গোতিয়ের-এর মাদমুয়াজল দ্য মপ্যাঁ-র ইংরেজী তর্জমা যখন হাতে এসেছিল তখন থেকেই বিশ্বাসটা পাকা হয় যদিও 'আলোচনা' গ্রন্থের 'কবির কাজ' রচনায় সাহিত্যের উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষতা কামনা করে আসছিলেন। 'কড়ি ও কোমলে'র সামান্য কিছু পরে লেখা 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য (১২৯৪ : বৈশাখ) প্রবন্ধে বললেন, 'সাহিত্যই সাহিত্যের উদ্দেশ্য'। সাহিত্যের সার্থকতা সাহিত্যে সন্ধান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ অস্কার ওয়াইল্ডের পূর্বোক্ত গ্রন্থ প্রকাশের আগে। তবে **'Preface to Dorian Grey'র 'all art is useless'** কথাটির অনুবাদ কিন্তু ১৩৪০-এর 'সাহিত্য তত্ত্ব' প্রবন্ধে বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়' উক্তিটি। অবশ্য এর আগে ১৯১৭ (মে মাসে প্রকাশিত)-এর *Personality* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : **'Art for art's sake also has its origin in the region of the superfluous'.**[৭] অথবা, **'Then comes Art, and we forget the claims of necessity, the thrift of usefulness'.** সোজাসুজি Art for art's sake সম্পর্কে বা ব্রাডলে-র মত 'Poetry for poetry's sake' শিরোনামে এর আগে কিছু তিনি লেখেন নি। 'আলোচনা'র পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ('কবির কাজ') রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য উদ্রেকের দ্বারা 'হৃদয়ের অসাড়তা অচেতনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা'র যে কথা বলেছিলেন তা চমৎকার মিলে যায় এড্‌গার অ্যালান পো-র (কলাকৈবল্য তত্ত্বে বিশ্বাসী) **'The poetic principle'** এবং **'The philosophy of composition'**-এর একটি উক্তির সঙ্গে : **'it excites by elevating the soul.'**

পূর্বোক্ত *Personality* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথে Art for art's sake-এর প্রতি সমর্থন জানাতে গিয়ে তুলেছেন সাহিত্যের উপযোগিতার প্রশ্ন এবং শিল্পে শিল্পী-ব্যক্তিত্বের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু মৌলিক জিজ্ঞাসা। উপযোগিতার প্রসঙ্গে এরপর নানা সময়েই রবীন্দ্রনাথকে বক্তব্য রাখতে হয়েছে। কারণটা হল, ১৩২১ এর কিছু আগে য়ুরোপীয় বস্তুবাদী সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বে আগ্রহী বাঙালী সাহিত্য-রসিকদের রবীন্দ্র-বিরোধিতা। ১৩১৮-এর বঙ্গদর্শনে বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বস্তুতন্ত্র-হীনতার অভিযোগ তোলেন। সঙ্গে যোগ দিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। স্বদেশে রবীন্দ্র পক্ষে ছিলেন আরও অনেকের সঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তী এবং প্রমথ চৌধুরীর মত পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও সাহিত্য-তত্ত্বে পণ্ডিতগণ। বিদেশে তখন য়েটস, স্টফোর্ড এ ব্রুক এবং ব্রাডলে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বসভায় অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। এদিকে ১৩০৯-এর 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে, ১৩১৩-এর 'শুভবিবাহ' নামক গ্রন্থ-সমালোচনায় এবং ১৩১৯-এর 'অন্তর বাহির' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় বাস্তবতার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করে এক

---

৬. *Laughter*—**Bergson. Tr. Brereton & Rothwell, 1913. P. 157**

৭. *Personality.* **P. 10.**

ধরনের বস্তুবাদ-বিরোধী বক্তব্য জানাচ্ছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁর তত্ত্ব-ভাবনায় বস্তুবাদ প্রাধান্য পায় নি। ১৩১৮-এর পর থেকে য়ুরোপীয় 'রিয়ালিজম' রবীন্দ্র-বিরোধীদের এবং সেই কারণে আত্মপক্ষ সমর্থনে উদ্যোগী রবীন্দ্রনাথের প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হল। সাহিত্যের সার্থকতা সাহিত্যে—এই ভাববাদী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই সাহিত্যের বাস্তব উপযোগিতার প্রসঙ্গটি প্রাধান্য পেয়ে গেল। রবীন্দ্র-বিরোধীরা সাহিত্যিকদের লোকশিক্ষকের ভূমিকায় দেখতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ জানালেন লোকশিক্ষার কী হবে সে প্রশ্নের জবাব দেয় না সাহিত্য। অর্থাৎ কলাকৈবল্যের দুর্গটি রবীন্দ্রনাথ যেন আক্রমণের মুখে আরও শক্ত করে তুলতে চাইলেন। ১৩৩০ থেকে কয়েকটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নব্যতন্ত্রীরা রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাঙলা সাহিত্যে এনে ফেললেন বিপরীত তরঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ এই নব্যতন্ত্রীদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রশংসা করলেও এঁদের গল্প উপন্যাসে যৌনতার অতিরেককে নিন্দা করলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। সমস্যা মেটাতে নবীনদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দুদিনের বৈঠকের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আপন সিদ্ধান্তে অটল থেকে শুধু যৌনতার অবাঞ্ছিত অতিরেকের বিরুদ্ধে নয়, সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তববাদের বিরুদ্ধেও হলেন বিদ্রুপমুখর।

নবীনদের মুখপাত্র শরৎচন্দ্র তখন গর্কি-র প্রশংসা করে বাঙালী সাহিত্যিকদের এই রুশ লেখকের আদর্শ অনুসরণ করতে বলছেন, 'আত্মশক্তি'র সম্পাদকের কাছে একটি চিঠিতে নজরুল ইসলাম মানব মুক্তিতে মার্কসীয় দর্শনের ভূমিকার গুরুত্ব স্বীকার করছেন, শ্রমিক কৃষকের সদ্য গড়ে ওঠা সংগঠনে নিজেদের যুক্ত করেছেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং আরও অনেকে। এই পটভূমিতে ১৯২৭-এ লেখা 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জানালেন, 'রাশিয়া বা আর কোনো পশ্চিম দিগন্তে যদি গুরু নবীন বেশে দেখা দেন লালটুপি পরে বা যে-কোনো উগ্র সাজেই হোক তবে আমাদের দেশের ইস্কুল মাস্টারেরা অভিভূত হয়ে পড়েন'। একটু পরে 'রাশিয়ান হেডমাস্টার' কথাটা ব্যবহার করেছেন। সুতরাং রুশ সাহিত্য, বিশেষ করে মার্কসীয় ভাবাদর্শে রচিত রুশ সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিরাগ স্পষ্ট হয়ে উঠল। 'আনা কারেনিনা' রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগুক বা না-ই লাগুক, ১৩১৩-এর 'শিক্ষা' গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে তলস্তয়ের কিঞ্চিৎ প্রশংসা করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ঠাঁই পেয়েছিল তুর্গেনেভ-এর *Smokes* (ইংরাজী অনুবাদ)। কিন্তু গর্কি বা শেখভের জন্য প্রশংসাসূচক কিছু লেখেন নি, লেখেন নি নরওয়ের ইবসেন সম্পর্কেও। তাছাড়া ১৯২৭-এর তিন বছর পরে রাশিয়া থেকে ঘুরে এসেও সাহিত্যে বস্তুজীবনের স্থান বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্পর্কে তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন নি। ১৯২৭-এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধের 'সাহিত্যে নবত্ব') আরও একটি মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মন্তব্যটি হল গরজের ফরমাশ বড়ো হয়ে উঠলে সাহিত্যে যে খর্বতার দিন আসে 'তখন ইকনমিকসের অধ্যাপক, বায়োলোজির লেকচারার, সোসিয়লজির গোল্ড মেডালিস্ট সাহিত্যের প্রাঙ্গণে ভিড় করে ধর্ণা দিয়ে বসেন।' একটু পরে, 'সেই চরমের নমুনা য়ুরোপীয় সাহিত্যে ডার্বিজম ...' স্পষ্টতঃই রবীন্দ্রনাথ এখানে য়ুরোপীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে গড়ে ওঠা কতকগুলি আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন।

'বায়োলোজির লেকচারার' বলতে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ জোলা প্রমুখ ন্যাচারালিস্টদের কথাই বলেছেন। জোলা'র প্রথম উপন্যাস *Therese Raquin* ( ১৮৬৭ ) ঝড় তুলে দিয়েছিল পাঠক মহলে। এই বই-এর ২য় প্রকাশ ১৮৬৮-এ। ঐ সংস্করণের মুখবন্ধে জোলা বললেন, **'I chose characters completely dominated by their nerves and their blood, derived of free will, pushed to each action of their lives by the fatality of their flesh'** ফ্লোব্যার-এর 'মাদাম বোভারি' পুস্তকাকারে বেরিয়েছিল ১৮৫৭-এ। ১৮৬৬-র ১৬ই ডিসেম্বর তাঁর বন্ধু জর্জ স্যান্ড-কে ফ্ল্যোবার লেখেন, 'হৃদয় দিয়ে লেখার দিন শেষ হয়েছে। কারুরই উচিত নয় সাহিত্যে আপন ব্যক্তিত্বকে অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া। আমি বিশ্বাস করি, মহান শিল্প বৈজ্ঞানিক এবং নৈর্ব্যক্তিক'। দু'বছর পর ( ১৮৬৮ ) জোলা বললেন, 'শল্যচিকিৎসক মৃত দেহের উপর যা করেন আমি সেই কাজ করেছি সজীব দেহে'। ফ্লোব্যার, জোলা প্রমুখের ভাবনালোকের একটি স্ফুলিঙ্গ যখন ১৩৩০ থেকে বাঙলার নব্যতন্ত্রীদের চেতনায় আলোড়ন তুলেছিল তখন জোলা-র চেয়েও রবীন্দ্রনাথের বিব্রত হওয়ার কারণ ছিলেন দেশীয় তরুণেরা। কল্লোলীয়রা যখন ফ্লোব্যার জোলা অথবা মনঃসমীক্ষণবাদী ফ্রয়েড-এর কাছাকাছি ঘুরছেন, তার কিছু আগে ১৯১৫-১৬ তে প্রতীচ্যে ডাডা-র জন্ম এবং সম সময়ে ( ১৩৩০ এর কাছাকাছি ) অধিবাস্তববাদীদের প্রথম দলিল প্রকাশ করলেন ডাডা আন্দোলনের অন্যতম শরিক আঁদ্রে ব্রেতোঁ।

রবীন্দ্রনাথ 'ডাডা পন্থী'দের মধ্যে দেখেছিলেন এক জাতের চরমতা। ডাডা আন্দোলনের জন্মভূমি জুরিখ ছিল ফ্রয়েড-পন্থী মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের জন্মভূমি। জুরিখে ত্রিস্‌তানৎ সারা, আমেরিকার মার্সেল ডুকাম্প, ফ্রান্সের পিকাবিয়া এবং আরও এক আধটি পত্র পত্রিকায় পশ্চিম মহাদেশে কেউকেউ গড়ে তুললেন এই আন্দোলন। জীবনের যাবতীয় মূল্যবোধকে অস্বীকার করে, মানবমনের অবচেতন স্তরকে গুরুত্ব দিয়ে শৈল্পিক পারিপাট্যকে মিথ্যাচার বলে ঘোষণা করে এরা স্বয়ংক্রিয় রচনা'র মহিমা ঘোষণা করতে লাগলেন। ত্রিস্‌তান ৎসারা-র এই মন্তব্যে, শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, অনেকেই নৈরাজ্যবাদী মানসিকতা লক্ষ্য করেন যে, **'Take a newspaper, take scissors, choose an article, cut it out, then cut out each word put them all in a bag, shake.'** প্রচলিত কাঠামো ভেঙে এই ধরনের কাব্যচর্চায় আগ্রহী ছিলেন না বেশীর ভাগ কাব্য-জিজ্ঞাসু। ডাডা-পন্থীদের এই ধরনের কথা মনে রেখেই ১৩৩৫-এ ( 'সাহিত্য সমালোচনা' ) রবীন্দ্রনাথ বললেন, কেবল মাত্র না-মানার দ্বারা সাহিত্যিক হওয়া যায় না। য়ুরোপীয় ডাডাপন্থী এবং তাদের ভাবৈতিহ্যের উত্তরাধিকারীরা মানবমনের নিগূঢ় সত্যসন্ধিৎসায় শিল্প-নির্মিতির সাধারণ সূত্রকে যেভাবে অস্বীকার করেছিলেন তার নঞর্থক দিকটা সাময়িক ভাবে বিপ্লবাত্মক মনে হয়। কিন্তু এঁদেরই হাত ধরে এসেছিলেন অধিবাস্তববাদীরা ( **sur-realist** ) এবং কিছু পরে অ্যাবসার্ডিস্ট'রা অর্থাৎ 'মডার্নিস্ট'রা। বৃহত্তর জীবন-বিমুখতার সঙ্গে অহং-মুখিতার মাদকতা, প্রথাবর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্নতর এক প্রথার সম্ভাবনাকে এঁদের রচনায় প্রকাশোন্মুখ দেখা গিয়েছিল। বলাবাহুল্য, সিন্ধুপার থেকে এঁদের প্রভাব যখন পেঁচচ্ছিল আমাদের কাছে, বৈজ্ঞানিক দিক থেকে অনুন্নত এদেশে

যৌন-বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের সত্য এবং সেই কারণে সাহিত্যেও বর্জনীয় নয় বলে ঘোষণা করতে শোনা যাচ্ছিল তখন হার্বার্ট রীড-এর মত রবীন্দ্রনাথেরও মনেহয়েছিল এই বাস্তবতা আসলে 'least flattering to human dignity'। কাব্যে নব্যতন্ত্রীদের উৎকৃষ্ট পক্ষের অন্যতম প্রতিনিধি জীবনানন্দ তাঁর একটি রচনায় জানিয়েছেন, কিভাবে রবীন্দ্রনাথকে নমস্কার জানিয়ে তাঁরা সরে এসেছিলেন মালার্মে-ভার্লেন-র‍্যাঁসার-য়েট্‌স্‌-এলিঅটের জগতে। রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় যুগান্তরের সম্ভাবনা লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'কালের নৈবেদ্যে লাগে যে সকল আধুনিক ফুল আমার বাগানে ফোটে না সে' ( 'আগন্তুক' : পরিশেষ ১১.৭.৩২)। এই যুগান্তরের অগ্রপথিকেরা যাঁদের অনুকরণ করেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশের রচনাই বিষয়মুখ্য। উনিশ শতকের মধ্যলগ্নে ঔপন্যাসিক ফ্লোব্যার বলেছিলেন, হৃদয় দিয়ে লেখার দিন শেষ হয়েছে এবং নৈর্ব্যক্তিকতাই একালে বড় কথা। ঔপন্যাসিকের তত্ত্ব যখন ভিড় করেছিল ওদেশের কবিতায় এবং তার প্রভাব পড়েছিল আমাদের দেশেও, তখন রবীন্দ্রনাথের বিদ্রূপ ঝলসে উঠেছিল—এঁরা সৌন্দর্যের প্রাচীরে বসিয়েছেন ভাঙা কাঁচের টুক্‌রো এবং নিরন্তর বাছাই করে চলেছেন শুক্‌নো ফুলের রাশি, অ্যাপোলো-র হাসির পাশে দেখছেন ব্যাঙের হাসি। এঁরা শুকনো পাটের যাচনদার, কলেঠাসা বিরহের যুগে এঁরা মেঘদূতে বীতশ্রদ্ধ, এঁরা দূর থেকে দেখা, বিশুদ্ধ দেখাকেই বলেন, নিরপেক্ষতা বা নৈর্ব্যক্তিকতা। এঁদের সাহিত্যাদর্শে আগ্রহী ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। বিশেষ করে যে-সাহিত্য ফ্লোব্যার-এর ভাষায় 'Impersonal' এবং 'Scientific' যা বিষয়ীকে অস্বীকার করে, সেই জঙ্গম য়ুরোপের বিজ্ঞান-প্রভাবিত সাহিত্যাদর্শে রবীন্দ্রনাথ বিরক্ত এবং স্বদেশে তার প্রভাব লক্ষ্য করে সন্ত্রস্ত। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস—'রচয়িতার মধ্যে আর একজন কে রচনাকারী আছেন' ('আত্মপরিচয়' )। রচয়িতার অভ্যন্তরস্থ যে রচনাকারী তার সম্পর্কে 'জাপানযাত্রী'তে লিখছেন, 'আমির প্রকাশই সাহিত্য, আর্ট। তার মধ্যে কোনো দায়ই নেই, কর্তব্যেরও দায় না'। এই 'আমি' যে প্রাত্যহিক সংসারের 'আমি' নয় তা বোঝানোর জন্য এক প্রসঙ্গে তিনি উপনিষদের দুই পাখির কথা স্মরণ করেছেন,—একজন ভক্ষক, অন্যজন দর্শক। আর দ্বিতীয়টিই শিল্পী-ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্ব শুধু দর্শন করে না, সৃষ্টিও করে। সৃষ্টির তাৎপর্য হল যেখানে মানুষ নিজেকে 'উৎসর্গ' করে, সুতরাং এই স্রষ্টা-ব্যক্তিত্ব বৈজ্ঞানিক-শোভন নিরাসক্ত দর্শক ন'ন।

অধ্যাপক প্রবাসজীবন চৌধুরী কীটস, ক্রোচে এবং এলিঅটের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, পাশ্চাত্যের কবি ও দার্শনিকেরা বলেন, 'কাব্যে কবির ব্যক্তিত্ব প্রকাশ হয় না'।[৮] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবি-ব্যক্তিত্ব যদি হয় 'রচয়িতার মধ্যে আর এক রচনাকারী', তাহ'লে তার সমর্থন কি পাশ্চাত্য কাব্য দর্শনে মেলে না? ১৮১৮'র ২৭শে অকটোবর বন্ধু উডহাউসের কাছে কীটস 'Poetical character' সম্বন্ধে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেখানে কীটস বলেছিলেন, 'It has no character' একটু পরে লেখেন :

৮. রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ, পৃ. ১০৬।

> **A poet is the most unpoetical of anything in existence, because he has no Identity—he is continually in for and filling some other body.**

এই চিঠির পিছনে ছিল হ্যাজলিট ( Hazlitt )-এর একটি বক্তৃতার প্রভাব। ১৮১৮'র জানুআরি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে হ্যাজলিট 'Lectures on English Poets' নামে যে তিনটি বক্তৃতা করেন তার তৃতীয়টির শিরোনাম ছিল 'On Shakespeare and Milton.' কীটস এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। হ্যাজলিটের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত কীটস কবি ব্যক্তিত্বকে 'Negative Capability' বলে উল্লেখ করেছিলেন, যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'রচয়িতার মধ্যে আর একজন' রচনাকারীর মিল খুব স্পষ্ট। এই রচনাকারীকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, লেখকের Personality, যার সঙ্গে অভিন্ন নয় প্রাত্যহিক সংসারের ইনডিভিডুয়ালিটি। বেনেদেত্তো ক্রোচে বলেছেন, আমাদের সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্বের পাশে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হচ্ছে আর একটি অসংকীর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং 'if pure intuition (and pure expression, which is the same thing) are indispensible in the work of art, the personality of the artist is equally indispensible.' এলিঅট তাঁর 'Tradition and Individual Talent' এ শিল্প সৃষ্টিতে 'Continual self sacrifice or continual extinction of personality' লক্ষ্য করলেও তিনি যাকে 'personality' বলেছেন তা আসলে রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'Individuality'। সৃষ্টির রহস্যে ব্যক্তির ভূমিকা পর্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কোনই মতানৈক্য ছিল না, কারণ তিনি 'man who suffers' এবং 'mind which creates' দুই-এর পার্থক্য মেনে নিয়েই শিল্পী-ব্যক্তিত্বকে catalyst বা অনুঘটকের সঙ্গে উপমিত করেছিলেন। 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে' রবীন্দ্রনাথের এই কথার তাৎপর্য বুঝতে পারলে প্রবাসজীবন বাবুর অভিমত মেনে নেওয়া যায় না। স্রষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সেই 'আমি' যে কিনা 'স্বপনমুরতি গোপন চারী'। *Creative unity* গ্রন্থে তাকে বলেছেন অন্তরবাসী 'এক' এবং ১৩২৩-এর একটি চিঠিতে জানালেন, অন্তরের ঐ একই নিজেকে সর্জন করে, প্রকাশ করে। সুতরাং যে-নৈর্ব্যক্তিকতার ধর্ম হল 'নিছক দেখা' রবীন্দ্রনাথ তাকে মানেন নি। এইভাবে য়ুরোপীয় ন্যাচারালিস্টদের বৈজ্ঞানিক অনাসক্তি, ডাডা-পন্থীদের কোন কিছু না 'মানার তালঠোকা পালোয়ানি' যেমন রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পেল না, তেমনি পেলেন না ইকনমিকসের অধ্যাপক ও সোসিওলোজির গোল্ডমেডালিস্ট। অর্থাৎ একই সঙ্গে ন্যাচারালিজম, ডাডা ও সোস্যালিস্ট-রিয়ালিজম্ কোনও আন্দোলনের প্রতিই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের সমর্থন ছিল না। ১৩০৯-এ 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে যে কথাটা কবি বলেছিলেন, ১৩২১-এর পর থেকে, সেই কথাই যেন নানাভাবে জানিয়ে বললেন, 'বাস্তবিকতা কাঁচপোকার মতো আর্টের মধ্যে প্রবেশ করিলে তেলাপোকার মতো তাহার অন্তরের সমস্ত রস নিঃশেষ করিয়া ফেলে'।

জাত-রোমান্টিক এবং পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক কাব্য ও কাব্যতত্ত্বের রসিক, যিনি কীটসকে সমস্ত জীবন নানাভাবে স্বীকার করে তাঁর ভাবনায় অনুভাবিত হয়েছেন, তিনি শুধু

মনের মানুষ য়েটস-ব্রিজেস-স্টফোর্ড এ ব্রুকের খোঁজই নেন নি, আর্নল্ড-রাস্কিন-কার্লাইল-কে ছুঁয়ে দেখা করে এসেছেন রোমা রলাঁর সঙ্গে, ইতালির বেনেদেত্তো ক্রোচের সঙ্গে ; মনের মিল না হলেও তলস্তয়-গর্কি-ইবসেনের রচনার খোঁজ নিয়েছেন, হুইটম্যানের *Leaves of grass*, তুর্গেনেভের *Smokes* ভালেরি র *Variety*, রাসেলের *Literary Essays* এবং হার্বার্ট স্পেন্সরের সৃষ্টি সম্ভার রেখেছেন নিজের সঞ্চয়ে। পাউণ্ড-এলিঅট-এমি-লোয়েল-এর মত 'ইমেজিস্ট' গ্রুপের কবিরা যাঁরা এক সময় লণ্ডনের সোহো জেলার এক রেস্তোরাঁয় নতুন আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, নন্দনতত্ত্বের মৌলিক প্রশ্নে তাঁদের সঙ্গে মতভেদ সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন তাঁদের কবিতাও। কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা, রূপটা গদ্য বা পদ্য যাই হোক না-কেন, একথা বুঝেও কেন জীবনের শেষ দশকে গদ্য-ছন্দে লিখলেন চারখানি কাব্য, যদিও আগে গদ্য ও পদ্যের স্বতন্ত্র সীমানায় ছিলেন বিশ্বাসী ? ১৩৩৯-এ শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ-কে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বললেন, গদ্যের চাল পথে চলার চাল, পদ্যের চাল নাচের। দুটোকে যে তিনি মেলাতে চাইলেন সে কি এলিঅট-পাউণ্ডের সঙ্গে তাল মেলাতে ? কারণটা যাই হোক, উপমাটা মনে করিয়ে দিচ্ছে পল ভালেরি-র ' Remarks on Poetry' প্রবন্ধের একটি উক্তি।

ভালেরি বলেছিলেন, গদ্য হল 'walking' আর কবিতা 'dancing' যদিও dancing 'uses the same limbs, the same organs, bones, muscles and nerves as walking does' তথাপি 'dancing is quite different'. ভালেরি-র *The Art of Poetry* ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন ডেনিস ফোলিঅট ( Denise Folliot )। ঐ বই-এর ভূমিকায় টি এস এলিঅট জানিয়েছেন—ভালেরি-র আগে মালার্ব ঐ একই উপমানের আশ্রয়ে গদ্য ও কবিতার পার্থক্য বুঝিয়েছেন। সুতরাং সাদৃশ্যটা দেখার মত। প্রভাব সন্ধানে লাভ নেই। কিন্তু 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে ( ১৩৩১ ভাদ্র ) এবং কিছু পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে প্রদত্ত বক্তৃতায় ( ১৯২৬ ১০ই ফেব্রুআরি ) ও অন্যত্র কাব্য-সত্যের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা যেমন কীটস-এর সুন্দরই সত্য, সত্যই সুন্দর [৯] অথবা 'কল্পনা যাকে সুন্দর বলে মেনেছে বাস্তবে তা না থাকলেও সত্য'[১০] ইত্যাদির সঙ্গে বেশ মিলে যায়, তেমনি মিলে যায় ফরাসী-ভাববাদী দার্শনিক বের্গসঁ-র এই কথার সঙ্গে :

> So art, whether it be painting or sculpture, or poetry or music has no other object than to brush aside the utilitarian symbols, the conventional and socially accepted generalities, in short, everything that veils reality from us, in order to bring us face to face with reality itself.[১১]

৯. 'Beauty is truth, truth beauty'—*Ode on a Grecian urn*.

১০. 'What imagination seizes as beauty must be truth whether it existed before or not'. ১৮১৭'র ২২শে নভেম্বর বেইলি-র কাছে লেখা কীটস-এর চিঠি।

১১. *Laughter*—H. Bergson. Tr. Cloudesley Brereton and Fred Rothwell, Macmillan & Co. 1918. P 157.

বের্গস-র *Laughter*-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত ছিলেন কি! তবে বের্গস-র *Laughter* না পড়েই 'কৌতুকহাস্য' এবং 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' লেখা সম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে, যেমন *Creative Evolution*-এর ষষ্ঠ পৃষ্ঠা (অনুবাদ) না পড়েও রবীন্দ্রনাথ লিখতে পেরেছিলেন—আমাদের ব্যক্তিত্ব (Personality) 'grows with our growth, it changes with our changes'। তবে ১৩৩১-এর ভাদ্র-এর 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধের বেশ কিছুটা অংশ যে হার্বার্ট স্পেন্সরের কাছ থেকে সোজাসুজি নেওয়া তাতে সন্দেহ নেই। উক্ত প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ছোটো মেয়ে যে মাতৃভাব নিয়ে জন্মেছে তার পরিচালনার জন্যই সে পুতুল নিয়ে খেলে'। তৃতীয় অনুচ্ছেদে লিখেছেন 'কুকুরের জীবনযাত্রায় যে লড়াইয়ের প্রয়োজন আছে, দুই কুকুরের খেলার মধ্যে তারই নকল দেখতে পাই। বিড়ালের খেলা ইঁদুর-শিকারের নকল। 'খেলার ক্ষেত্র জীবযাত্রা ক্ষেত্রের প্রতিরূপ'। স্পেন্সরের *Principles of Psychology*-এর দ্বিতীয় খন্ডের ৬৩০-৩১ পৃষ্ঠা দেখা যাক :

> ··· dog and other predatory creatures show us unmistakably that their play consists of mimic chase and mimic fighting—they pursue one another, they try to overthrow one another, they bite one another as much as they dare. And so with the kitten running after a cotton-ball, ... we see that the whole part is dramatizing the pursuit of prey ... It is the same with human beings. The plays of children—nursing doll, giving tea-parties, and so on, are dramatizing of adult activities.[১২]

মিলটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। ভাববাদী স্পেন্সর, কান্ট ও শিলার-এর পথে এগিয়ে কাব্য-সাহিত্যকে কবির Play বা খেলা বলেছেন। 'খেলা' শব্দে আপত্তি ছিল রবীন্দ্রনাথের; তিনি চেয়েছিলেন 'লীলা' শব্দটি। 'লীলা' হল, তাঁর মতে, 'অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে প্রত্যক্ষগোচর করায় দ্বারা তাকে পর্যাপ্ত দান' করার চেষ্টা। কিন্তু এই 'লীলা'র সঙ্গে প্রকৃত অর্থে স্পেন্সর-প্রমুখের 'খেলা'র কোন পার্থক্য নেই।

সচেতন মনে সমকাল ফেলবেই তার ছাপ। বিরূপ প্রতিক্রিয়া জাগালেও অস্বীকার করা যায় না তাকে। তাই রোমান্টিক নন্দনতত্ত্বে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ এমন কিছু কবিতা বা নাটক লেখেন, উপন্যাসে তুলে ধরেন এমন কিছু সমস্যা যা অবশ্যই বস্তুনির্ভর। ও-পাড়ার প্রাঙ্গণে নিত্য যাতায়াত না থাকলেও ও-পাড়ার মানুষের যন্ত্রণা এবং তা থেকে উত্তরণের প্রয়োজনটাও জানা ছিল তাঁর। ভাবলোকের প্রাধান্যে বিশ্বাসী হয়েও বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদী-বিস্তারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সরব, প্রগতিশীল লেখক সম্মেলন তাঁর

১২. *Principles of Psychology Vol II*, Williams & Norgate, 1881 3rd Edition pp 630-31

শুভেচ্ছা কামনা করত। সাহিত্যে রূপ ও রসের গুরুত্ব স্বীকার করে ব্যক্তিস্পর্শহীন বস্তুর আধিপত্যের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন বাঙ্ময়। প্রয়োজনের দরবারে দাসখত লিখে দেবে সাহিত্য—এটা মানতে পারেন নি, মানতে পারেন নি অখণ্ড সাহিত্যকর্মকে ফ্রয়েডীয় সাইকো-অ্যানালিটিকাল পদ্ধতিতে বিচার করা অথবা লালটুপি পরা কোন হেডমাস্টারের খবরদারি। বস্তুবাদী সাহিত্যিকদের মহৎ সৃষ্টিগুলির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচিতি হয়ত ঘটে নি, স্বদেশী অনুকারীরাই তাঁকে ভাবিয়েছিল। হতে পারে রোমাণ্টিক ও ভিক্টোরীয়রা যতটা রেখাপাত করেছিল তাঁর মনে, সেখানেই নিজেকে বেঁধে ফেলে স্বদেশী নবীনদেরউগ্র অসহিষ্ণুতাকে কিছুটা অস্বস্তির সঙ্গে গ্রহণ করায় এক সময় তাঁর চিন্তালোকে আর কোন নবীনতত্ত্ব প্রবেশের ছাড়পত্র পায় নি। কিন্তু মানতেই হবে, বিশেষ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দার্শনিক শোভন আগ্রহ ছাড়াই সমকালীন পাশ্চাত্ত্য নন্দনতত্ত্বের মূল সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার মুহূর্তেও বিশ্বাসের কেন্দ্র থেকে স্খলিত হন নি রবীন্দ্রনাথ। ভাবভূমির গভীর থেকে জাত তাঁর কাব্য-কবিতার সঙ্গে ভাবনালোকজাত তত্ত্ব চিন্তার ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হয় নি। তাঁর সচল ও সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব যাবতীয় নবীনতার প্রতি আগ্রহী থেকেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রোমাণ্টিক নন্দনতত্ত্ব চিন্তার সঙ্গে ছিন্ন করেনি যোগসূত্র। এলিঅটের এই উক্তিটি তাঁর সম্পর্কে একান্ত সত্য এবং এখানে প্রাসঙ্গিক বলে উদ্ধার করা যেতে পারে :

> When the critics are themselves poets, it may be suspected that they have formed their critical statements with a view to justifying their poetic practice.[১৩]

এলিঅট নিজে ছিলেন কবি নাট্যকার ও সমালোচক। যিনি *The Waste Land, The Hollow M n, The Ash Wednesday,* লিখেছেন ; লিখেছেন *Murder in the Cathedral* সেই তিনিই লিখেছেন *The Sacred Wood, What is Classic ? The use of Poetry and the use of Criticism*' ·· ইত্যাদি। সুতরাং কবি-সমালোচক সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য তাঁর সম্পর্কেও প্রযোজ্য মনে করি এবং মনে করি নিতান্ত অপ্রযোজ্য নয় যে-কোন সাহিত্যিক-সমালোচক সম্পর্কেই।

১৩. *The use of Poetry and the use of Criticism* T.S. Eliot. Faber & Faber Ltd-1964. P 29

৪

# রবীন্দ্রোত্তর পর্ব

উনিশ শতকের বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যের পথিকৃৎ বঙ্কিম তাঁর 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকদের কাছ থেকে দূরে চলে এসেছিলেন তাঁদের নম্র নমস্কার জানিয়ে। সেদিন বোঝা গিয়েছিল, সাহিত্যের এই নতুন শাখা নতুন পথে বাঁক নেবে, যার সঙ্গে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের সংযোগ নেই। 'রস' শব্দটির বারংবার ব্যবহার সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ফিরে যান নি অলঙ্কার শাস্ত্রের দূরধিগম্য রহস্যের মধ্যে। সুশীল কুমার দে ১৯২৩-২৬ খৃষ্টাব্দে বিলেত থেকে দু'খণ্ডের *Studies in the History of Sanskrit Poetics* প্রকাশ করে ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কে আমাদের আগ্রহী করে তোলেন। ১৯২৬-এ অতুলচন্দ্র গুপ্ত 'সবুজপত্র' পত্রিকায় 'কাব্যজিজ্ঞাসা' লেখেন এবং ১৯২৭-এ সেই রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্র সম্পর্কে অতুলচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত অথচ মনোরম রচনা বাঙালী পাঠকদের রসশাস্ত্র আলোচনায় আগ্রহ বৃদ্ধি করেছিল নিঃসন্দেহে। বাঙলা ভাষাভাষীরা অভয় গুহের 'সৌন্দর্যতত্ত্ব', সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' ও 'কাব্যবিচার', সুধীরকুমার দাশগুপ্তের 'কাব্যালোক', রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'রসসমীক্ষা', বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের 'সাহিত্য মীমাংসা', 'কাব্যমীমাংসা' পড়ার সুযোগ পেয়েছেন ক্রমে ক্রমে। বাঙলায় লেখা রসতত্ত্বের সরস আলোচনার ক্ষেত্রে 'কাব্যজিজ্ঞাসা'র পরেই 'রসসমীক্ষা'র স্থান পাণ্ডিত্যের সঙ্গে রসগ্রাহী চিত্তের এই ভাবসম্মিলন অবশ্যই বিরলদৃষ্ট। কিন্তু এ সবের মধ্যে উপেক্ষিত থেকে গিয়েছে এঞ্জিনিয়র-কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'কাব্য-পরিমিতি' এবং সু-কবি সুকুমার রায়ের 'বর্ণমালাতত্ত্ব'।

যতীন্দ্রনাথের 'কাব্য-পরিমিতি' ১৩৩৭ এবং ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে 'উপাসনা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে অবশেষে ১৩৩৮-এর আষাঢ়ে প্রকাশিত হয়। যতীন্দ্রনাথ, জানি না, সবুজপত্রের লেখক অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্যজিজ্ঞাসা'র দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন কি-না। 'রসোত্তীর্ণ কাব্য বাহিয়া রসলোকে কবিচিত্তের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে পারিলেই রসোন্মুখী অর্থাৎ সুরসিক পাঠকচিত্তের কাজ শেষ হইল', ভারতীয় রসপ্রস্থানীদের সঙ্গে একযোগে একথা বললেও যতীন্দ্রনাথ ভারতীয় কাব্যশাস্ত্র-কারদের মত কবিচিত্তধারাকে অস্বীকার করেন নি। ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা 'প্রতিভা'-কে 'সহজা' ও 'উৎপাদ্যা' অথবা 'কারয়িত্রী' ও 'ভাবয়িত্রী' এইভাবে ভাগ করলেও অলৌকিক কবি-প্রতিভাকে মূলতঃ অবিশ্লেষ্য জ্ঞান করতেন এবং কবিচিত্তের গভীর তলের রহস্য উদ্ঘাটনে যত্ন নেন নি। 'রস' কেন অনুভব-নির্ভর এবং কেন কাব্য বোঝা গেলেও 'রস'কে বোঝা যায় না প্রথমেই সে ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যতীন্দ্রনাথ কাব্য জগতে শুধু 'সহৃদয় সামাজিকে'র ভূমিকা নয় কবির গুরুত্বও উল্লেখ করে বললেন 'এই ব্যাপারে দুইটি পৃথক ধারা কাজ করিতেছে। প্রথমটি—কবিচিত্তধারা, যাহা কাব্য সৃষ্টি করে। অপরটি—পাঠকচিত্তধারা, যাহা কাব্য উপভোগ করে।' বস্তুতঃ প্রাচীন প্রাচ্য আলঙ্কারিকদের মত রস যে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর যতীন্দ্রনাথ সে-কথা বললেও কবিচিত্ত যে বস্তুজগৎ থেকেই উপাদান সংগ্রহ করে এবং ক্রমে ভাব, কল্পনা, বাসনা, ইত্যাদি দ্বারা

সৃজনমুখী হয়ে ওঠে সে বিষয়ে আলোকপাত করলেন। বাঙলা কাব্য কবিতা থেকে এক একটি রসের জন্ম-রহস্য তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেই তুলনায় অতুলচন্দ্রের 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' অনেক বেশী সংস্কৃতগন্ধী ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছিল। তবে ভাব, কল্পনা, বাসনা, রীতি, অলঙ্কার প্রভৃতির ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ও নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ছাত্র যতীন্দ্রনাথ কাব্য-দর্শনের একটি ডিম্বাকার রেখা চিত্র অঙ্কন করলেন। এই রেখাচিত্রে যতীন্দ্রনাথ দেখালেন, কবিচিত্তধারা বস্তু থেকে কাব্যে দক্ষিণে আবর্তিত হচ্ছে এবং পাঠকচিত্ত আবর্তিত হচ্ছে বস্তু থেকে কাব্যে বাম দিকে।

> কাব্য সৃষ্টি ও তাহার আস্বাদ গ্রহণ পরস্পর বিপরীতাভিমুখী।...একের যাহা গন্তব্য, অপরের তাহা পথিমধ্যস্থ বিশ্রাম স্থান। কবিচিত্তের উদ্দেশ্য রস নহে, রস আনিয়া কাব্যে সঞ্চয়; আর পাঠকচিত্তের উদ্দেশ্য কাব্য নহে, কাব্য হইতে রস সংগ্রহ।

এই রেখাচিত্র অঙ্কনের জন্য কবি অবশ্য গ্রন্থের উপান্ত অনুচ্ছেদের সর্বশেষ বাক্যে সলজ্জ ভঙ্গিতে জানিয়েছেন, 'তথাপি রসজ্ঞদের নিকট আমি আমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি'। যতীন্দ্রনাথ যে কারণে লজ্জা প্রকাশ করেছেন, তা একালে কৌতুককর। কাব্যালোচনায় রেখা-চিত্রের ব্যবহার পাশ্চাত্যে এখন একটি সচল পদ্ধতি এবং তার সফল অথবা হাস্যকর অনুকরণ বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায় প্রায়শঃ চোখে পড়ে। ত্রিশের দশকে এই পদ্ধতির চলন ছিল না, সুতরাং যতীন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টা আমাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করে।

'কাব্য-পরিমিতি' সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারী রচনা। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ 'উপভাব' শব্দটি যে ব্যভিচারীভাবের পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন সেটি লক্ষণীয়। তা ছাড়া ভারতীয় আলঙ্কারিক বামনাচার্য তাঁর 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তিঃ'তে রীতিকে কাব্যাত্মা বলে ঘোষণা করলেও রীতি-কে ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে আলোচনা করেন নি। তিনি বলেছেন, ছন্দ-কে রীতির অঙ্গ মনে করা ভুল হবে। 'শব্দের কঙ্কালের উপর যে বিশেষ অঙ্গসংস্থান যোজনা করিলে সাহিত্য কবিতারূপ গ্রহণ করে তাহারই অপর নাম ছন্দ'। রীতি-কে যতীন্দ্রনাথ দুই ভাগে ভাগ করেছেন—মুক্ত ও ছন্দিত। তিনি গদ্য রচনায় দেখেছেন মুক্ত ছন্দরীতির ব্যবহার এবং কবিতায় ছন্দিত রীতির অভিব্যক্তি। কাব্যকে যতীন্দ্রনাথ যে 'ভাবসমুত্থ' এবং 'কল্পনাসমুত্থ' এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন তা কিন্তু প্রাচ্য অলঙ্কার শাস্ত্র-সম্মত নয়। ঋষি বাল্মীকির শোকাভিভূত চিত্ত থেকে উৎসারিত কাব্য 'ভাবসমুত্থ', কারণ অন্যতম ক্রৌঞ্চ শরবিদ্ধ হলে কবিকণ্ঠ থেকে তৎক্ষণাৎ যে উচ্ছ্বাস অভিব্যক্ত হয়েছিল তার মধ্যে কল্পনার কোন অবকাশ ছিল না। যতীন্দ্রনাথ এই 'ভাব-সমুত্থ' কাব্যকেই 'বাসনাসমুত্থ' বলেছেন। অন্যদিকে কল্পনাসমুত্থ কাব্য, কবিচিত্ত এবং পাঠকচিত্তে বাঞ্ছিত একটি প্রবাহ রচনা করে, যার নাম আনন্দ। আবার যেহেতু পাঠক আনন্দ পায়, সুতরাং বুঝতে হবে 'রস আছে'। 'কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার

মিলনে রসের আস্বাদন চলিতে থাকে—যাহা সংসার-বৃক্ষের অমৃতময় ফল'। 'সিদ্ধান্ত' অংশে যতীন্দ্রনাথ কাব্যের এবং পাঠকচিত্তের চারটি করে শ্রেণীবিভাগ করে গাণিতিক পদ্ধতিতে চারটি সূত্র প্রস্তুত করেছেন যা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য কোন অলংকারশাস্ত্রেই নেই। যেমন : (ক) ভাবসম্মুখ কাব্য + ভাবমুখী চিত্ত = ভাববিলাস ; খ) বাসনাসম্মুখ কাব্য + বাসনামুখী চিত্ত = বাসনা বিলাস ; (গ) কল্পনাসম্মুখ কাব্য + কল্পনামুখী চিত্ত = কল্পনানন্দ, (ঘ) রসোত্তীর্ণ কাব্য + রসোন্মুখী চিত্ত = রস।...লক্ষণীয় যে 'বিলাস'-যুক্ত শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন এবং এই জাতের কাব্য শ্রেণীকে হীন গোত্রীয় বলেছেন।

'কাব্য-পরিমিতি'তে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যতীন্দ্রনাথ। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা-শাস্ত্রের সংস্কার বর্জন করেন নি। তদুপরি সংস্কৃত কাব্য নয়, বাঙলা কাব্য থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে তিনি বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর অসামান্য গ্রন্থ 'কাব্যজিজ্ঞাসা'য় দু'একটি দৃষ্টান্ত বাঙলা সাহিত্য, বিশেষতঃ রবীন্দ্রকাব্যসাহিত্য থেকে নিয়ে বাকি সমস্তই প্রাচ্য আলংকারিকদের অনুসরণে সংস্কৃত কাব্য-কবিতা থেকে উদ্ধার করেছেন। যতীন্দ্রনাথের রচনা অজস্র উদাহরণ সমৃদ্ধ এবং সমস্তই বাঙলা কাব্য কবিতা থেকে। অলংকার শাস্ত্রের গবেষক হিসেবে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের খ্যাতি উল্লেখ্য নয়. কিন্তু ১৩৩৮-এর 'কাব্য-পরিমিতি' অবশ্যই অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্যজিজ্ঞাসা'র পর অসামান্য সংযোজন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, 'কাব্য-পরিমিতি' রচনাকালে কবি যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা' (১৯২৩), 'মরুশিখা' (১৯২৭) এবং 'মরুমায়া' (১৯৩০)-র মধ্যে মরু-চারণা সবে মাত্র শেষ হয়েছে ; 'সায়ম' (১৯৪০), 'ত্রিযামা' (১৯৪৮) এবং 'নিশান্তিকা' (১৯৫৭)-র পর্ব শুরু হতে বেশ কিছু দেরী। পালা বদলের মধ্যবর্তী সময়েই রসতাত্ত্বিক যতীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশ করলেন 'কাব্য-পরিমিতি'তে (১৩৩৮)।

সুকুমার রায়ের শিল্পের জগৎ প্রচলিত পদ্ধতির নিরিখে 'অচেনা' 'অজানা' উদ্ভটের জগৎ। কিন্তু শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে সুকুমার রায় তাঁর 'বর্ণমালাতত্ত্ব' গ্রন্থে যে বোধ ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা অকস্মাৎ স্রষ্টা ও তাত্ত্বিকের বৈপরীত্যে আঘাত করে বসে পাঠককে। সুকুমারের শিল্পী-চেতনায় ছিল সুমিতিবোধ। শিল্পে 'অত্যুক্তি' আলোচনায় তিনি বলছেন, 'শিল্পীর মনের ভাবটিকে রক্ষা করিতে হইলে এরূপ একটা 'মিথ্যা'র আশ্রয় লওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর ছিল না। শিল্পের হিসাবে অত্যুক্তিটা যথার্থ ভাবসঙ্গত সুতরাং এক্ষেত্রে সত্য সঙ্গত'। Art-এর ক্ষেত্রে Exaggeration ততটুকু সহনীয়, তা ভিন্ন নয়। Realism বলতে যা বোঝায় তা যে শিল্পের পক্ষে হানিকর তাত্ত্বিক-সুকুমার তা ভালোভাবেই জানতেন। 'ফটোগ্রাফি' যা চিরকাল সাহিত্যের রাজদরবারের বাইরে থাকত তাকেও অন্দরমহলে এনেছিলেন তিনি। কিন্তু সতর্ক ব্যক্তিটি 'অতিশয়োক্তি' এবং 'অতিকথন' যে কতটা পৃথক তা চমৎকার বুঝিয়ে দেন এই বলে, 'অতিরিক্ত কথা বলাটাও একপ্রকারের অত্যুক্তি এবং কাব্যের ন্যায় শিল্পেও তাহা নিন্দনীয়'। সুতরাং 'হ য ব র ল 'হয়ে যাওয়া জীবনটার মানুষ গুলো যখন 'আবোল

তাবোল' বকে তখন সুকুমার তাঁর বিদ্রূপের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা ব্যবহার করেছেন জাগতিক নিয়ম কানুন সব ভেঙে। কাফ্‌কা যদি লিখতে পারেন ছিল মানুষ হল গণ্ডার অথবা জ্যান্ত মানুষের চেয়ে মড়া মানুষের বুদ্ধি বেশী, তাহ'লে সুকুমারের বেড়াল রুমাল হতে পারে। চন্দ্রবিন্দুও হতে পারে। হিজিবিজবিজের এধার ওধার চতুর্দশ পুরুষ সবার নামই 'হিজিবিজবিজ, কেবল শ্বশুরের নাম বিস্কুট। সন্দেহ নেই, সুকুমারের অজস্র রচনায় মজা আছে, স্রেফ কৌতুক আছে; কিন্তু যেখানে পাঠকের কৌতুকের নেশার মৌতাত জমে উঠেছে সেখানেই অকস্মাৎ ভৌতিক চড়; সম্মুখে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত উজ্জ্বল দুটি চোখের মালিক সুকুমার রায়; যিনি তাঁর স্বল্প আয়ুষ্কালে বাঙালীদের ঝিমিয়ে পড়তে দেন নি রোমান্টিকতার আফিঙ খাইয়ে। তাঁর দেখার চোখ ছিল, ফটোগ্রাফিতে বস্তুর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টা ছিল, কিউবিস্ট ফিউচারিস্টদের শিল্পচেতনা সম্পর্কে পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি একটিবারও ভোলেন নি, 'শিল্পের হিসাবে অত্যুক্তিটা যথার্থ ভাবসঙ্গত সুতরাং এক্ষেত্রে সত্য-সঙ্গত'।

সুকুমারের সঙ্গে অর্ধেন্দ্রকুমারের মতানৈক্য ঘটেছিল। সেই অনৈক্য বড় সামান্য ছিল না, অন্ততঃ এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রূপশিল্প' প্রবন্ধে অর্ধেন্দ্রকুমারের এই সিদ্ধান্তকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে শিল্প জগতে প্রত্যেক শিল্পই স্বরূপে সার্থক বলে শিল্পের ক্ষেত্রে 'কম্যুনালিজম' সত্য নয়। সুকুমার তাঁর নিজস্ব বিচার দৃষ্টিকোণগত স্বাতন্ত্র্যের জন্যই অর্ধেন্দ্রকুমারের সমালোচনা করেছিলেন। সুকুমার কবিতা ও ছবিকে একসঙ্গে মিলিয়ে লুইস ক্যারল ও টেনিয়েল-এর মিলিত বিগ্রহরূপে বাঙালী কাব্য-রসিকদের বিস্মিত করেছিলেন। কাব্য-সত্যকে উপলব্ধি থেকে দর্শনেন্দ্রিয়বেদ্য করে তোলার সাধনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। সুতরাং নিষ্ঠাবান তাত্ত্বিকের মত তাঁর এই বক্তব্য কৌতূহলোদ্রেকী —'রিয়ালিজম শিল্পের মূল ভিত্তি আইডিয়ালিজমে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং উভয়ের সমন্বয়ে তাহার পূর্ণ সফলতা'। 'আবোল তাবোল'-এর সুকুমার রায়ের মুখে এই উক্তি অনেকেরই প্রত্যাশিত ছিল না। যিনি 'ফ্যানটাসি'র জগতের রূপকার, 'রিয়ালিজম' সম্পর্কে তাঁর এই উক্তি পাঠকের চিন্তাকে নাড়া দেয় প্রবল ভাবে। তাঁর চিত্ররূপময় রচনাগুলি কি তাহলে নিতান্তই কল্পনা-বিলাস নয়?

সুকুমার শব্দ ও অর্থের অদ্বৈতসিদ্ধি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট তত্ত্বভিত্তিতে আশ্রিত ছিলেন। সেই ভিত্তি ছিল সুদৃঢ় অথচ অলক্ষ্য, ভিন্নতর আচ্ছাদনে আবৃত। 'শব্দ কল্পদ্রুম'-এ যে সুকুমার রাত কেটে যাওয়ার মত সাধারণ কথাকে খ্যাঁশ খ্যাঁশ ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ বলে বিশেষিত করেন, মনের নৃত্যকে বোঝান 'ধেই ধেই ধিনতা' প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক শব্দ দিয়ে এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য বালকের বাড়ির লোক ও প্রতিবেশীদের প্রতিক্রিয়াকে বক্তব্যানুযায়ী ছবিতে ধরেন, সেই সুকুমার রায়কে বিচিত্রের পরীক্ষক খেয়াল রসের লেখক মনে হয়। কিন্তু 'বর্ণমালাতত্ত্ব'-এর 'ভাষার অত্যাচার'-এ তিনি যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্য করেন তা যে কোন কাব্যতাত্ত্বিকের মুখে শোভা পায়:

> ভাষা যে নিজের অর্থ গৌরবেই সত্য, একথা ভুলিয়া সে যখন কেবলমাত্র শব্দগৌরবে বড় হইতে চায়, তাহার অত্যাচার অনিবার্য। চিন্তা কোনদিনই শব্দের দ্বারা, নিঃসন্দেহরূপে ও সম্যক রূপে ব্যক্ত হইতে পারে না।

শব্দ ও অর্থের নিত্য-সম্পর্ক এবং শব্দের বাচ্যার্থ ও লক্ষণাগত অর্থকে অতিক্রম করে ব্যঙ্গ্যার্থ সৃজনে সাফল্য প্রভৃতি নিয়ে পন্ডিতদের বিতর্ক দীর্ঘকালের। কিন্তু যে সুকুমার অনায়াসে লেখেন 'হাঁসজারু', 'বকচ্ছপ', 'ফুটস্কেপ'; মিল দিতে পারেন 'জল্লাদ'-এর সঙ্গে 'আহ্লাদ'-এর, লিখতে পারেন 'ঘ্যানর ঘ্যানর ঘ্যানঘ্যানে আর প্যানপ্যানে', কল্পনা করতে পারেন 'আকাশের গায়ে নাকি টক্‌টক্ গন্ধ', তিনি শব্দের সামর্থ্য এবং বক্তব্য-প্রকাশের ক্ষমতাকে যে যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাতে সংশয় নেই। ভাষা যে বক্তব্যকে প্রকাশ করে, পাঠককে বোধ ও বোধির জগতে উত্তীর্ণ করে দেয় এবং পাঠক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে তাঁর মনে ভিন্ন জগৎ রচনা করতে পারে তা সুকুমার রায় অবশ্যই দেখিয়েছেন। তাঁর ভাষার বিরাট অংশই তো 'অ্যাবসার্ড'; অন্ততঃ দৈনন্দিনতার মধ্যে বা অভিধানে লভ্য নয়। কিন্তু এই ভাষা যা বোধের চারদিকে দেওয়াল দিয়ে একটি জগৎ গড়তে চেষ্টা করে না, বরং চতুর্দিক উন্মুক্ত করে দেয় পাঠকের চৈতন্যের স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য সেই ভাষা যেমন তথাকথিত সাহিত্যের ভাষা নয়, তেমনি অভিধানের ভাষাও নয়। Absurd language কেন বলা হবে না তাকে? জীবনের ভাষাগুলো স্থানভেদে ভিন্ন অথচ বোধগম্যতার মানদণ্ডে আপনার উচ্চমূল্য দাবি করে। সুকুমার রায় দুটোকেই আঘাত করলেন। 'হ য ব র ল'-এর ব্যাকরণ সিং-কে আমরা ভুলতে পারি না। সে বলেছে, 'আমি খুব চমৎকার ব্যা করতে পারি তাই আমার নাম ব্যাকরণ আর শিং তো দেখতে পাচ্ছ।' ছাগনন্দনের এই দাবি বৈয়াকরণকে কিঞ্চিৎ কৌতুক দান করে মাত্র যদি তিনি 'ক্যাবলের পত্র' না পড়েন :

> আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে বাঙলাদেশে কেউ ব্যাকরণ পড়ে না এবং পড়তে জানে না। অর্থাৎ আমাদের দেশে রসবোধ ছাড়াও আর একটি বোধের বিশেষ অভাব রয়েছে, সেটা ঐতিহাসিক বোধ নয়, সেটা হচ্ছে মুগ্ধবোধ। ব্যাকরণের মধ্যে তাঁরা মাল এবং মশলার পার্থক্য বোঝেন না। ব্যাকরণের মধ্যে তাঁরা ভাষাতত্ত্বের মশলা দেখেন, ইতিহাসের মাল দেখতে পান না।

ব্যাকরণ সম্পর্কে আমাদের একটা প্রচলিত সংস্কার আছে যেখানে 'মশলা'টাই প্রধান অর্থাৎ বোধ অপেক্ষা স্মৃতির ধারণশক্তির উপরেই তার বলপ্রয়োগ। সুতরাং ব্যাকরণ শিং-এর বিদ্রুপের কারণ অবশ্যই আছে। ব্যাকরণের দুরূহ তত্ত্বালোচনায় সুকুমার আগ্রহী ছিলেন না, যদিও এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। তবে স্মরণ করা যেতে পারে, এই সময়ে ফার্দিনান্দ দ্য স্যসুর ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে দিয়েছিলেন। সুকুমার Serious আলোচনায় তাত্ত্বিকের উদ্যম কখনই অনুভব করেন নি, এক্ষেত্রেও নয়।

যতীন্দ্রনাথ ও সুকুমার, ১৮৮৭-এর দুই জাতক কবি-হিসেবে রবীন্দ্রানুজ, কিন্তু রবীন্দ্রানুসারী ছিলেন না—ভাবে নয়, ভঙ্গিতে নয়, তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তেও নয়। মরুচারী

কবি যতীন্দ্রনাথ জীবনের সহজতাকে স্বীকার করার আগেই 'কাব্যপ-রিমিতি'তে আত্ম-প্রকাশ করলেন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে পণ্ডিত রূপে। যুগের বাতাস তখন পশ্চিম মহাদেশ থেকে আগত। কিন্তু প্রথা-বিরোধী যতীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রেও প্রথার বিরোধিতা করলেন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে অধিকার প্রমাণ করে। আর রবীন্দ্র-ভক্ত এবং স্বদেশে ও বিদেশে রবীন্দ্র-সঙ্গ লাভের সুযোগ লাভ করেও সুকুমার রবীন্দ্রনাথের শিল্প-সাধনা ও সাহিত্য-দর্শনের প্রত্যয়গত সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি মাত্র করেন নি। অভিনব পদ্ধতিতে স্ব-সৃষ্ট শব্দের ইন্দ্রজালে জীবনের পরিচিত দিগন্তকে দেখতে গিয়ে সুকুমার স্বেচ্ছায় সরে এলেন অন্য জগতে। এই শতকের দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যলগ্নে তাঁর জন্ম পাশ্চাত্যে হলে অবশ্যই অ্যাবসার্ডিস্ট রূপে আত্মপ্রকাশ করতেন। কিন্তু 'কাব্য-পরিমিতি'র যতীন্দ্রনাথ যেমন মরুচারী-কবি যতীন্দ্রনাথের সহযাত্রী ন'ন, 'বর্ণমালাতত্ত্বে'র চিন্তাবিদ সুকুমারও ছিলেন না অজানা ও উদ্ভটের জগতের কাব্যকার সুকুমারের দোসর। অথচ কবির কাব্যতত্ত্বভাবনা তাঁর কাব্যসৃষ্টির সহগ হওয়াই কাম্য। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি-সমালোচকের ক্ষেত্রে এই যে সত্য তা সত্য ছিল রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও।

॥ ৭ ॥

রোমান্টিকদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা এবং বস্তুবাদীদের প্রতি বিরূপতা স্বতঃ প্রমাণিত হলেও সাহিত্যতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথকে একটি সংস্কার বলে উপেক্ষা করতে পেরেছেন কি কোনও বস্তুবাদী ? বিভিন্ন সময় সমকালীনদের তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ তাঁকে অস্বীকার করতে না পারারই প্রমাণ। দার্শনিকের অনড় সিদ্ধান্তের ভিত্তি থেকে নয়, কবির উপলব্ধির বিভিন্ন সীমান্ত থেকে তত্ত্বের আকারে যে-বোধের অভিব্যক্তি, কোনও দণ্ডধারী বিচারকের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। জীবনে একাধিকবার পূর্ব সিদ্ধান্ত খণ্ডন করার অপরাধে তাঁর উপর সমালোচকদের যে আঘাত নেমে এসেছিল তার কারণ তো কবি-সমালোচকের অদ্বৈত সত্তাকে বোঝার অক্ষমতা। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বচিন্তার বিবর্তন তাঁর স্রষ্টা-ব্যক্তিত্বের বিবর্তনের সঙ্গে অভিন্ন, যেমন চোখে পড়ে বিশ্বের তাবৎ সাহিত্যিক-সমালোচকদের ক্ষেত্রে; তবু কবি-সমালোচক ভালেরি প্রসঙ্গে এলিঅট-ব্যবহৃত নার্সিসাসের উপমান রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়! তাঁর শিল্পীসত্তা সামাজিক প্রসঙ্গে সাধ্যানু-যায়ী মুখর, তথাপি নান্দনিক সিদ্ধান্তে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বিপিনচন্দ্র পাল অথবা রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের উষ্মা সত্ত্বেও তিনি অর্থনীতির অধ্যাপক, জীববিজ্ঞানের লেকচারার এবং সমাজ বিজ্ঞানের স্বর্ণপদক-প্রাপ্তদের সাহিত্যের বিচারকের আসন দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন শেষ পর্যন্ত। ব্যক্তিগত ভাবে অসামান্য সমকালীন হয়েও সমকালীনতার ঊর্ধ্বে ছিলেন স্বভাবগত সেই স্বাতন্ত্র্যের গুণে, গড্ডলিকা প্রবাহে যা ভেসে যাওয়ার নয়। অনুজ কবি বুদ্ধদেব বসু এই সিদ্ধান্তে নির্ভুল ছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ 'স্বকালকে অবলম্বন করে ব্যক্ত করেছেন চিরকালকে, স্বদেশের জীবনের মধ্যে প্রকাশ করেছেন বিশ্ব জননী'। ভালেরি বা রিলকে-র নন্দন ভাবনা থেকে মহৎ উত্তরণ ঘটেছিল তাঁর! প্রতিনিয়ত সমকালের আদালতে নিজেকে বিচারপ্রার্থী করলে আগামী অনন্তকালের প্রশ্রয়লাভের প্রত্যাশা ত্যাগ করতে হত তাঁকে। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিমানদের বিপ্রতীপতা সত্ত্বেও

ভয়াবহ পরধর্মে তাঁর অনাসক্তি বঙ্গসংস্কৃতিকে রক্ষা করেছিল সুনিশ্চিত সন্নিপাত থেকে। সমকালের নৈবেদ্যে লাগে যে আধুনিক ফুল, হয়ত তাঁর বাগানে তা ফোটেনি, তথাপি তাঁর জীবদ্দশায় অথবা উত্তরকালে তিনিই কি সর্বাধিক আলোচিত, অনুকৃত এবং অনুসৃত হন নি? সত্তরে পেঁছে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথাগত ছন্দের শাসন থেকে 'বাঙলা কবিতা'কে বেড়া-ভাঙ্গা 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' দেন গদ্য ছন্দের নবীন রূপাবয়বে, অনভ্যস্ত পাঠকদের কাছে কৈফিয়ত দিতে বসেন প্রবল উৎসাহে, তখন বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার ঢেউ জাগে এখানে সেখানে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখে মধুসূদন কিন্তু জবাবদিহি করেন নি। উগ্র অসহিষ্ণুতা এবং প্রবল আত্মাভিমানে উল্টে তিনিই দাবি করে বসেছিলেন একদিন সবই 'ব্ল্যাঙ্ক ভার্স' হয়ে যাবে। যদি রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে,একদিন সবই হয়ে যাবে 'গদ্য কবিতা', তাহ'লে তার চেয়ে সত্য কী হত! কিন্তু পুনশ্চ-শেষ সপ্তক-পত্রপুট-শ্যামলী শেষ করে তিনি আবার সমিল কবিতা লিখতে বসেন। মধুসূদনের দৃঢ়তা কেন ছিল না তাঁর, সে প্রশ্ন অবান্তর। সত্তর বছর বয়সে পেঁছে নতুন পথে বাঁক ফেরা বড় কঠিন কাজ। যে বয়সে কবিতার উৎস স্থলই যায় শুকিয়ে, যে বয়সে মহাকালের নিষেধের তর্জনী সর্বদা ত্রস্ত করে রাখে, যে বয়সে আগামীর চিন্তাই প্রবল হয়ে ওঠে, সেই বয়সে স্বভাবতঃ সহিষ্ণু-র পক্ষে 'মধুসূদন' হওয়া সম্ভব নয়।

'পুনশ্চ' কাব্যের ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৩৩৯-এর আশ্বিনে (১৯৩২-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর)। তার আগেই 'নিশ্চিন্ত বৈদান্তিক' হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সমীহ আদায় করেও 'অনেকান্ত জড়বাদের আশ্রয়' নিয়েছিলেন। ১৯৩০-এ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ'র ভূমিকা লেখার দু'বছর আগে সুধীন্দ্রনাথ গদ্যভাষা ও কাব্যভাষার মৌলিক পার্থক্যে আস্থাহীন ওয়ার্ডস্বার্থের একটি মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁর 'স্বগত' গ্রন্থের 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে। 'লিরিকাল ব্যালাডস'-এর মুখবন্ধে ওয়ার্ডস্বার্থ লিখেছিলেন:

> ...The language of prose may yet be well adapted to poetry. ···It may be safely affirmed that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition.

সুধীন্দ্রনাথ প্রতিবাদে লিখলেন, 'গদ্য-পদ্যের সমীকরণ চেষ্টায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ কৃতকার্য হন নি, কারণ দৈনন্দিন ভাষা আর কাব্যের ভাষা বস্তুতই বিভিন্ন, বৈধমতেই বিভিন্ন এবং এই প্রভেদ পদ্যের স্বভাবগত'। 'পুনশ্চ'র রবীন্দ্রনাথ জানতেন এবং বলেছিলেন 'যাকে সচরাচর আমরা গদ্য বলে থাকি সেটা আর আমার আধুনিক কাব্যের ভাষা এক নয়..'। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ওয়ার্ডস্বার্থের পথের পথিক ছিলেন না। কাব্যের বিষয়রূপে এতদিন ছিল যা অস্বীকৃত, যে-সব শব্দে ছিল একমাত্র কবিদেরই নিরঙ্কুশ অধিকার, রবীন্দ্রনাথ বললেন, গদ্যছন্দে কবিতা লিখে তিনি তার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করেছেন এবং পরিণামে কাব্যের অধিকারকে দিয়েছেন বাড়িয়ে। সব চেয়ে বড় কথা—তিনি মনে করেন—

হৃদয় জয় করাই কাব্যের মূল ব্যাপার, রূপটা গদ্য বা পদ্য যাই হোক-না কেন। 'পুনশ্চ'র আবির্ভাব এবং রবীন্দ্রনাথের কৈফিয়ত দেওয়ার প্রথম পালা সাঙ্গ হলে ১৯৩৩-এর 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'রসের নিমন্ত্রণে জাতিভেদ নেই —সেখানে গদ্য-পদ্য উভয়েরই সমান অধিকার, বিচার্য কেবল প্রবেশপ্রার্থীর মহানুভবতা আবেগের গভীরতা আর কার্য কারণের সুসঙ্গতি'···ইত্যাদি। 'রসের নিমন্ত্রণ' কথাটায় সুধীন্দ্রনাথ যে রবীন্দ্র-প্রভাবিত তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সিদ্ধান্ত তো সবটাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে। 'সাধনা' পর্বে পদ্যকে 'অন্তঃপুর' এবং গদ্যকে 'বহির্ভবন' বলে· অথবা কবিতাকে 'নদী' এবং গদ্যকে 'বিশেষত্বহীন বিল' বলে রবীন্দ্রনাথ গদ্য ও পদ্যের জন্য যে পৃথক ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, চল্লিশ বছর পরে 'পুনশ্চ'-এর কৈফিয়ত দিতে গিয়ে তাকেই অস্বীকার করেন। চার দশকের অবকাশ তো অনেকখানি। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ মাত্র তিন বছরেই তাঁর মত বদল করেছিলেন। কারণটা যে রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' তাতে সংশয় নেই। ১৩৪৪-এ কবি বিষ্ণু দে-ও প্রায় একই কথা বললেন. 'যতদিন না গদ্য ও পদ্যের পাশাপাশি থাকবার ব্যবস্থা বাংলা কবিতায় হচ্ছে ততদিন সামাজিক জীবনের অলিগলিতে বাংলার কবিতার যাতায়াত রুদ্ধ'। কিন্তু প্রতিবাদীদের মধ্যে মোহিতলালের মত কবিও ছিলেন যিনি ১৩৪৩-এর 'গদ্যছন্দ'-এর সাফল্যে সংশয় প্রকাশ করে বলেছিলেন 'গদ্য ছন্দ' এবং সোনার পাথর বাটি একই ধরনের কথা। বাঙলা কাব্যের উত্তরপর্বে এবং বিদেশী কাব্য-কবিতায় যে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন মিলেছে—মোহিতলালের নয়, ইতিহাসই তার সাক্ষ্যদাতা। মোহিতলালের মত আরও অনেক বিমুখদের রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই জানতেন। জানতেন এবং গদ্যছন্দের উজ্জ্বল পরিণাম সম্পর্কে নিজেও নিঃসংশয় ছিলেন না বলেই হয়ত ফিরলেন আগের কাঠামোতে।

'পুনশ্চ' থেকে, অথবা 'লিপিকা' থেকেই ছন্দোমুক্তির সাধনায় রবীন্দ্রনাথের যে নবতর প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, তা নিছক আর্টের বিলাসিতা ছিল না, ছিল তার চেয়েও বেশি কিছু। ছন্দের যাদুবিদ্যা প্রদর্শনে অভ্যস্ত ছিলেন না তিনি। অন্ততঃ গদ্যছন্দ ব্যবহারের যে কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন জিজ্ঞাসুদের কাছে, তাতে মনে হয়, ছন্দের ক্ষেত্রে অভিযোজ্যতাই ছিল তাঁর মুখ্য বিবেচ্য। উত্তরকালে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গটি আলোচনা করলেন নিস্পৃহ অবজেকটিভিস্ট-এর দৃষ্টিকোণ থেকে। রবীন্দ্র-পক্ষের মানুষ হলেও অর্পিতচিত্ত স্তাবকের মত নয়, যুক্তিবাদী সমালোচক হিসেবে তিনি বললেন :

> গদ্য-কবিতাকে কেবল নতুন আঙ্গিক হিসাবে ধরলে চলবে না। তার অন্তরের মনোভাব ও অর্থের নতুনত্ব—অর্থাৎ তার Content-এর তাগিদে গদ্য-কবিতাই inevitable কি না দেখতে হবে।[১]

আসলে 'পুনশ্চ' থেকে পাঠক মনে যে দুটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া চলছিল—একটি বৈমুখ্য, অপরটি অন্ধ পারবশ্য—যার কোনটিই স্বাস্থ্যকর নয়, ধূর্জটিপ্রসাদের মন্তব্যে তাদের উদ্দেশে সতর্কবাণী শোনা গেল। কবির কৈফিয়ত কবিরই, তটস্থ সমালোচকের নয়,

---

১. 'বক্তব্য' : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭। পৃ. ১৭৯

তথাপি কাব্যকে সাধারণ-জীবনের কাছাকাছি আনা অথবা সাধারণ জীবনকে কাব্যের বিষয়ে উন্নীত করা যদি রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় হয়ে থাকে, তাহলে গদ্যছন্দ তার সর্বোৎকৃষ্ট বাহন কিনা স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ ; কিন্তু কবিতা ও পাঠকের দূরত্ব ঘুচিয়ে দেওয়ার সামর্থ্যে সংশয় নেই। সুতরাং সাহিত্যকে জীবনমুখী করে, সকলের যদি না-ও হয় অন্ততঃ বহুজনের আয়ত্তে আনাই যদি রবীন্দ্রোত্তর কালের নন্দন-ভাবনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়, তাহ'লে সেই ভাবনার উন্মেষ কি রবীন্দ্রনাথেই ঘটে নি ? তথাপি তাঁর দানকে অস্বীকার না ক'রে যাঁরা বলেছেন কিছু নতুন কথা, সাহিত্যের নতুন নতুন সমস্যার মুখোমুখি হ'য়ে, তাঁরাই তত্ত্ব-ভাবনার ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন একালের সীমানায়। তাঁদের জন্ম রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে, তাঁরা লিখতেও শুরু করেছেন সেই পর্বে, কিন্তু সৃষ্টিতে এবং তত্ত্বভাবনায় নিজত্বের গুণে উল্লেখযোগ্য।

*Kali the Mother*-এর বিবেকানন্দ সর্বক্ষণের সাহিত্য সাধক ছিলেন না। গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পের সমঝদার, সুরসিক, তীক্ষ্ণধী পুরুষ বিবেকানন্দ জীবন এবং সেই কারণে শিল্প-সাহিত্যেও মহৎ একটি উদ্দেশ্যের প্রেরণা সন্ধান করেছেন। সাহিত্য তাঁর কাছে জীবন-ভাবনা তথা সমাজ-ভাবনা থেকে পৃথক ছিল না। অথচ বিবেকানন্দ যখন জানান, 'পাশ্চাত্য আইডিয়ালিজম' হল 'পুষ্পাবৃত শবদেহ', প্রকৃত কাব্যকে বর্ণনা করেন বহুবর্ণরঞ্জিত চিত্রপটের মত মনোরম শব্দময় চিত্ররূপে, ভাষা প্রসঙ্গে বলেন, সরল সহজবোধ্য রচনাই সর্বোৎকৃষ্ট, 'মেঘনাদবধ' ও তার স্রষ্টাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন, যীশুর শেষ ভোজসভার ছবিতে ঔচিত্যবোধের বিপর্যয় লক্ষ্য করে বিরক্ত হন ; তখন সন্দেহ থাকে না, হয়ত ভিন্ন এক স্তর থেকে জন্ম নিয়েছে তাঁর কবিতা, কিন্তু বাণীময় সেই কাব্যরূপ গঠনে সচেতন নন্দনতাত্ত্বিক ছিলেন গোপনে সক্রিয়। সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা বঙ্কিমের কাল থেকেই চোখে পড়ে। পণ্ডিতি ভাষা ও আলালী ভাষা-র মধ্য থেকে আর একটি ভাষা-রীতি গড়ে নিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন তিনি। তৎসম শব্দের বাহুল্য, সমাস-বদ্ধ পদের ব্যবহারাতিরেক যদি পণ্ডিতি-রীতির প্রধান লক্ষণ হয়, তাহ'লে আনুপাতিক বিচারে মধ্যগারীতির প্রবর্তক বঙ্কিম কি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে অতিক্রম করে নিজেই নিজের প্রতিপক্ষে পরিণত হন নি ? তাত্ত্বিক ভাবনার সঙ্গে প্রয়োগে যোগ অভিন্নতা দেখাতে পেরেছিলেন তিনি কিন্তু বিবেকানন্দ। গুরু ভাইদের কাছে লেখা চিঠি পত্রে, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'পরিব্রাজক'-এ ( 'বর্তমান ভারত'-এ নয় ) বিবেকানন্দ যে-ভাষা ব্যবহার করেছিলেন 'বাঙ্গালা ভাষা'য় ( 'ভাববার কথা' ) তার তাত্ত্বিক সমর্থন আছে :

> চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না ? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার করে কি হবে ? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর ; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূত কিমাকার—উপস্থিত কর ?.. ভাষা—ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরে মতির সাজ পরানো ঘোড়ার উপর, বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায় ?

শেষের 'জিজ্ঞাসা' চিহ্ন যুক্ত বাক্যটি কী অসামান্য ! সর্বক্ষণের সাহিত্য রচয়িতা নন, এমন কি উত্তরকাল যাঁকে নিতান্ত ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃতির ভয়ে সাহিত্যের পৃষ্ঠায় কুণ্ঠিত একটু স্থান করে দেয়, সেই বিবেকানন্দের এই সত্যোপলব্ধি-সমৃদ্ধ তীব্র ভাষার

মধ্যে তত্ত্বগত ভিত্তি ছিল আশ্চর্যরকম। ইংরেজিতে লেখা 'On Language' প্রবন্ধটিতে সারল্যকে সর্বোত্তম স্টাইল বলে গণ্য করার সিদ্ধান্তও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'দি লাইফ ডিভাইন' এবং 'সাবিত্রী'-র লেখক শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্যের জগতে অধিকার ছিল সুবিস্তৃত। তিনি বিবেকানন্দের তুলনায় কাব্য-সাহিত্য সম্পর্কে মতও প্রকাশ করেছেন অনেক বেশী এবং তাঁর অধিকার কালিদাস থেকে মধুসূদন, শেকসপীয়র থেকে মিল্টন-র‍্যাঁবো-ভার্লেন-মালার্মে-'শ-লরেন্স পর্যন্ত সম্প্রসারিত। নিঃসন্দেহে সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা বিস্ময়কর ব্যাপ্তির অধিকারী। কিন্তু তাঁর যাবতীয় বিচারকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এই বিশ্বাস যে, প্রত্যেক মহৎ সৃষ্টির 'original source of inspiration' রয়েছে একটি subtle plane-এ। তাঁর এই ব্যাখ্যার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে সন্ত অগাস্টিন, র‍্যালফ ওয়াল্ডো এমার্সন অথবা ডেভিড থোরুর বিশ্বাসের। 'Literature like anything else can be made an instrumentation for the Divine life' এই জাতীয় অভিমত অরবিন্দের চিঠিতে একাধিকবার পাওয়া যায়। বিস্ময় জাগে, যখন শুনি 'Lawrence was a yogi', কিন্তু ফরাসী কবি বদল্যার-এর কাব্য বিচারকালে যখন লেখেন, 'He chose the evil of life···to extract poetic beauty out of it', তখন মনে হয়, এই তো বিশুদ্ধ সাহিত্যবিচার, দিব্যজীবনের কোন চিহ্নমাত্র নেই এই সিদ্ধান্তের মর্মমূলে। ঐ একই বিচার সূত্রের পুনরুক্তি ঘটেছিল বার্নার্ড শ'-এর নাটক আলোচনা কালে। শ্রীঅরবিন্দ একটি ভালো কবিতার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য সন্ধান করতেন : ১. Emotional Sincerity, ২ Mastery over language, এবং ৩. Power of inspiration। ভাবাবেগগত নৈষ্ঠিকতা এবং ভাষার উপর প্রভুত্ব সম্পর্কে প্রথম দুটি সূত্রে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত যে কোন বস্তুবাদীও প্রশংসার চোখে দেখেন। তলস্তয়ের 'On Art' প্রবন্ধে এই তত্ত্ব দুটির উচ্চারণ ও বিশ্লেষণ আমাদের চোখে পড়েছে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ যে 'Power of inspiration'-এর কথা বলেছেন তা এমন একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার যাকে Imagination বা কল্পনার সঙ্গে সমীকৃত করা যায় না। এই Inspiration, শ্রীঅরবিন্দের মতে, 'a very uncertain thing' অত্যন্ত অনির্দিষ্ট একটি ব্যাপার। এই Inspiration যেমন Imagination নয়, তেমনি যাকে 'genius' বলে তাও নয়। প্রতিভা যে শিক্ষা-নিরপেক্ষ কোন দেবদত্ত সামগ্রী নয়, সে বিষয়ে সংশয় নেই প্রতিভার অনন্যতায় বিশ্বাসী কোন প্রতিভাবানেরও। 'প্রতিভা' দক্ষতার সঙ্গে মিলিত হয়ে তবে পূর্ণতা পায়। কিন্তু অরবিন্দের 'Inspiration'-এর মর্মোদ্ধারে প্লেটোর enthousiasmos বা স্বর্গীয় আবেশের এবং প্লেটো-র অনুগামীদের furor poeticus বা Poetic madness-এর তত্ত্বটি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। এই সঙ্গে মার্কিন দার্শনিক এমার্সন-এর 'Over Soul' তত্ত্বও স্মরণীয়। এমার্সন স্বীকার করেছেন, তিনি এক আদর্শ কবির প্রতীক্ষায় হয়ত বৃথাই অপেক্ষমান যার মধ্যে Over Soul-এর প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং দৃঢ়তার সঙ্গে যিনি এগিয়ে চলেন তাঁর Vision-কে কাব্যরূপ দিতে। শ্রীঅরবিন্দ-কথিত কবিরাও পৃথিবীতে দুর্লভ, যেহেতু যে Inspiration-এর বশে তাঁরা স্রষ্টা, সেই inspiration আসে যুক্তি বুদ্ধির অনধিগম্য কোন স্তর থেকে, অনবরত নয়, থেমে থেমে। সেই inspiration-এর আবির্ভাব যখন সফল তখন লরেন্সও সিদ্ধযোগী।

এমার্সন-বৃত্তের থোরু একেই বলেছিলেন 'revelation'। তবে এমার্সন, থোরু ও ফুলারের মত শুধুই কবিতে নয়, কাব্যরূপেও শ্রীঅরবিন্দের ছিল নিবদ্ধ দৃষ্টি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীঅরবিন্দের তুলনায় বিবেকানন্দের সাহিত্য ভাবনার প্রকাশ স্বল্প পরিসরে বদ্ধ, কিন্তু তাঁর নন্দন-ভাবনা অনেক বেশি প্রয়োজনাত্মক, ঋজু, যুক্তিনিষ্ঠ এবং বাস্তব।

॥ গ ॥

কাব্য সৃষ্টির রহস্য কোনও বুদ্ধিমানের বীক্ষণাগারে অনির্ণেয় বলে কবি ও ভাবুকের মনে তাকে ঘিরে বিচিত্র ভাবনা। কী সেই পদার্থ যার তাড়নায় স্থান-কালের ভুল হয়, ইন্দ্রিয়-বোধের বিপর্যয় ঘটে? উত্তরে মার্কসবাদী মানিকের মুখে শোনা যায় শ্লেষ-জড়িত দু' একটি মন্তব্য :

> প্রতিভাকে এক রকম রহস্যময় পদার্থ মনে করার ফলে লেখক কবিদের এ জিনিসটার ওপর প্রায় একচেটিয়া অধিকার জন্মে গেছে।[২]

এবং

> আসল কথাটা এই : দুটি জিনিস নিয়ে প্রতিভা—দেহের উপকরণাদির উৎকর্ষ এবং আঁতুড় থেকে প্রতিটি মুহূর্তের প্রভাব ঘরের বাইরের কাজের অকাজের প্রত্যেক মুহূর্ত।[৩]

জৈবিক বিকাশের প্রতিটি মুহূর্তকে প্রাতিভ শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখা মানিকের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে জড়িত। কিন্তু প্রতিভাকে ঐশিক ভাবার পরিবর্তে নিতান্তই জৈবিক ভাবা হঠকারী সিদ্ধান্ত নয় ত! প্রতিভা সেই সহজাত শক্তি যে-শক্তির সামর্থ্য আছে প্রতিটি মুহূর্তের আহ্বানে এবং সংঘাতে সজাগ হতে এবং উত্তর দিতে। অবশ্যই এই শক্তির বিকাশ ক্রমিক, জন্ম-মুহূর্তেই পরিণত নয়। দেহ বা মস্তিষ্কের কোন্ কোষে তার পুষ্টি বা বিবর্ধন, যতদিন না জীববিজ্ঞানীর বুদ্ধিগম্য হচ্ছে, ততদিন তার রহস্য নিয়ে বিতর্ক পণ্ডশ্রম। কিন্তু মানিক যখন বলেন, 'জনসাধারণ না থাকলে কারখানার উৎপাদনের যেমন মানে হয় না, প্রতিভার উৎপাদনও তেমনি অর্থহীন',[৪] তখন সন্দেহ থাকে না, ভোগ্য ও ভোক্তার সম্পর্ক চিন্তায় যুক্তিশাসিত মানিক কোনও আনন্দদায়ক রহস্য ভাবনার লালন পছন্দ করেন না। কারখানার ভোগ্যপণ্যের সঙ্গে প্রতিভার উৎপাদনকে সম্পর্কিত করা পছন্দ করবেন না, এমন বিচারকের সংখ্যাই বেশী। দেহ ধারণের জন্য ভোগ্যপণ্য ও নিষ্কাম আনন্দের জন্য সাহিত্য, একই প্রেরণার সৃষ্টি এ কথা কি কেউ মানেন? কিন্তু তলিয়ে দেখলে স্পষ্ট হয়, মানব অস্তিত্বের সার্থকতায় দেহের পুষ্টি ও

২. প্রতিভা : ১৯৪৭ শারদীয়া 'স্বাধীনতা'।
৩. ঐ
৪. ঐ

মনের তুষ্টি দুইই গুরুত্বপূর্ণ। মানিকের যুক্তিবাদী চৈতন্য থেকে ভাববাদ-বিরোধী যে কথা উচ্চারিত হয়েছে তা অকস্মাৎ দীর্ঘকাল-লালিত সিদ্ধান্তকে আঘাত করে, বিশেষতঃ এই কারণে যে শিল্প-সাহিত্যকে আমরা মান্য করি 'সৃষ্টি' বলে, 'উৎপাদন' রূপে নয়। হয়ত মার্কসীয় সিদ্ধান্ত 'art is a form of social consciousness' বিজড়িত হয়েছিল তার বিশ্বাসের মূলে অথবা ছিল ফয়ারবাখের বিরোধিতা করে মার্কস বলেছিলেন যে কথাটি 'The human essence is no abstraction inherent in each single individual. In its reality it is the ensemble of the social relations.'

'প্রতিভা'কে প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকেরাও অনৈসর্গিকী বলেন নি। রাজশেখর বলেছিলেন, প্রতিভা হল 'মানসপ্রত্যক্ষ' এবং স্রষ্টাও ভোক্তা দু' এরই প্রতিভার প্রয়োজন—একজনের 'কারয়িত্রী' এবং অপরজনের 'ভাবয়িত্রী'। তবে কবিপ্রতিভা'র বিকাশের জন্য চাই 'ব্যুৎপত্তি' এবং 'অভ্যাস'। 'ব্যুৎপত্তি' ঘটায় কবিত্বশক্তির বিস্তার এবং 'অভ্যাস' প্রতিভাকে উদ্ভাসিত করে। 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তিঃ'তে বামনাচার্য প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি এবং অভ্যাসের নিত্য সম্পর্ক প্রতিপাদিত করতে আগ্রহী ছিলেন। জার্মান দার্শনিক কান্টের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যিনি 'প্রতিভা' বা 'কল্পনা' নামক innate mental disposition-এর বিকাশের জন্য Craftsmanship-এর অথবা 'academically trained' talent-এর প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন। বামনাচার্য একেই বলেছিলেন 'সহজ জ্ঞানের' সঙ্গে 'বিদ্যা'র মিলন। প্রতিভাবানদের নিজেদের চতুর্দিকে রহস্যের জাল বয়ন করার দুরভিপ্রায়কে মানিক নিন্দা করেছিলেন, সম্ভবতঃ এই কারণে যে অতি প্রাচীন এই শব্দটিকে বর্মের মত ব্যবহার করে নিজেকে সমাজ ও বৃহত্তর জীবনের দায়-দায়িত্ব থেকে অহং-এর সুরক্ষিত কক্ষে বাস করতে চান একালেরও অনেকে। কিন্তু প্রতিভা যে শিক্ষা-সাপেক্ষ ক্রমে গড়ে ওঠা একটি অন্তর্গত শক্তি এই সত্যের অস্বীকৃতি কোন বুদ্ধিমানের সাজে না। স্বয়ং মার্কসও মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য আলোচনায় মানুষের সৃষ্টির মধ্যে দেখেছিলেন 'laws of beauty'। মানিক 'প্রতিভার উৎপাদন'কে ভোগ্য-বস্তুর উৎপাদনের সঙ্গে সমীকৃত করতে চান নি, তবে দুটি ক্রিয়াকে পৃথক করার ভাববাদী প্রবণতাকে তিনি আঘাত হানতে চেয়েছিলেন।

যে-কালে মানিক কাব্য-কবিতাকে 'প্রতিভার উৎপাদন' বলে উল্লেখ করেন সেই সময় জীবনানন্দ বলেন 'অন্তঃপ্রেরণা আমি স্বীকার করি' এবং 'অনেকান্ত জড়বাদের' আশ্রিত সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'শিল্পপ্রতিভা লোকোত্তর প্রেরণার মুখপাত্র'। মনে হয় এ-কথা তো শ্রীঅরবিন্দের মুখেও শোভা পেত এবং এতো বৈজ্ঞানিক যুগে চরম এক অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু তারপরই যখন বুঝি 'ভাবপ্রতিভা' বা 'প্রতিভা' বলতে জীবনানন্দ বুঝতেন 'কল্পনা'কে—'আমার মনে হয় ইমাজিনেশন মানে কল্পনাপ্রতিভা বা ভাবপ্রতিভা'; এবং সুধীন্দ্রনাথ বলেন, 'আসলে প্রতিভা যদিও দুষ্প্রাপ্য তবু তার বিকাশ সর্বসাধারণের উপভোগ্য; যে-ক্ষেত্রে ভোগ বিদ্যমান, সেখানে ভোক্তা-ভোগীর সম্পর্কও নিঃসংশয়' অথবা, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যসংগ্রহের ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু বলেন, 'সংস্কৃত 'প্রতিভা' শব্দের আক্ষরিক অর্থ অনুসারে তা হয়ে ওঠে বুদ্ধির দীপ্তি, মেধার নামান্তর' তখন প্রতিভা-র

অলৌকিকতায় রবীন্দ্রোত্তর নবীনেরা আস্থাশীল ছিলেন কি না, ( যদিও শব্দটি ব্যবহার করেছেন অনেকেই, ) সেই বিষয়ে সংশয় হয় অনাবশ্যক। এমন কি সুধীন্দ্রনাথ মানিকের মত 'ভোগ' শব্দটি ব্যবহার করেন, যদিও সন্তর্পণে। বুদ্ধদেব আমাদের আরও খানিকটা ভাবিয়ে তোলেন, যখন তিনি ইংরেজী 'genius' শব্দে অলৌকিকত্বের আভাস খুঁজে পান এবং সংস্কৃত 'প্রতিভা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করে 'বুদ্ধি' 'মেধা' প্রভৃতির হদিশ পান। বস্তুতঃ প্রতিভাকে এঁরা কেউই ঐশিক ভাবেন নি, সেটাই মূল কথা। শ্রীঅরবিন্দ 'Power of inspiration'-ব্যাখ্যায় কাল্পনিক দিব্যলোকের অফুরন্ত উৎসে পেঁছে যান, কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর নবীনেরা সকলেই মানিকের মত খরভাষী বা নিরাভরণ না হলেও মৌলিক প্রত্যয়ে থাকেন স্থির। অবনীন্দ্রনাথ নানা কারণেই রবীন্দ্রভাব-স্পৃষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁর বলার ঢঙ ছিল এতই নিবিড় যে, অনেকের মনের কথা যেন একাই বলতেন এবং পড়লে মনে হয় এ যেন চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া খুশীর রঙ অথচ সব মিলে অনিচ্ছাকৃত একটি ছবি। 'প্রেরণা' সম্পর্কে সেকালের সঙ্গে একালের এবং একালের একের সঙ্গে অন্য অনেকের তর্কতাপিত পরিস্থিতিতে অবনীন্দ্রনাথ সুন্দর করে বললেন :—

> অর্জন নেই, ইনস্পিরেশন এলো—গড়তে গেলেম তাজ হয়ে উঠল গম্বুজ, গড়তে গেলেম মন্দির, হয়ে পড়লো ইস্টিশান বা সৃষ্টি ছাড়া বেয়াড়া বেখাপ্পা কিছু। ইনসপিরেশনের খেয়াল ছোট বয়সে শোভা পায় আর শোভা পায় পাগলে।[৫]

কলা-চর্চায় যে কৌশলের প্রয়োজন এবং কৌশল আকাশপট থেকে খসে পড়া সামগ্রী নয় অথবা নয় উদ্ভিদ সদৃশ, কৌশল পুনঃ পুনঃ চর্চায় তীক্ষ্ণতর এবং লক্ষ্যভেদী হয়ে ওঠে—অবনীন্দ্রনাথের লঘু চালের কথায় এই পরমার্থই নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'আর্টিস্ট'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'রূপকার', 'রূপদক্ষ' প্রভৃতি পছন্দ করতেন এবং কৌশল-কে বলেছিলেন সাহিত্যের 'পূর্তবিভাগ'। সুতরাং উত্তরসূরীরা শ্রীঅরবিন্দের নয়, রবীন্দ্রনাথেরই সন্নিকট ছিলেন। 'প্রতিভার উৎপাদন'—মানিকের এই কথায় সন্ত্রস্ত হওয়ার কিছু নেই। তিনি অবশ্যই সাহিত্যিকের ক্ষমতাকে যন্ত্রশক্তি অথবা সাহিত্যিককে কুশলী যন্ত্রী বলে মনে করেন নি।

ভাবপ্রতিভা ( বা Imagination ) এবং রূপ রচনার দক্ষতা যাঁর অধিকারে তিনিই শিল্পী, তিনিই সাহিত্যিক, এই সত্য মেনে নিয়ে অতঃপর শিল্পী-ব্যক্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে যাওয়া যেতে পারে। শিল্পী কে? অথবা, শিল্পী কে নয়? সু-অভিনেতা থেকে সু-বক্তা সকলেই দাবিদার শিল্পীর মর্যাদার। 'যে আমি স্বপন মুরতি গোপনচারী' সেই তো শিল্পীর সত্তা, সেই তো 'শবদে শবদে বিয়া দেয়'। অথবা, 'শিল্পী' তিনিই যিনি বলতে পারেন—

৫. বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী : 'রূপা'-সংস্করণ। পৃ. ১১

যা দিয়েছিলেম সে তো প্রাণরক্ত, অন্য সে রক্তিমে ;
আঁচল সোনালি গাঢ় আমারি প্রেমের মুগ্ধ হিমে ; [৬]

আপন 'প্রাণরক্তে', প্রেমের 'মুগ্ধ হিমে' শিল্পী বুনে দেন সোনালি আঁচল ; কিন্তু কী তার পন্থা, কী তার পাথেয় ?—

পাথেয় যার স্মৃতি কেবল, পন্থা যাহার অনাদ্যন্ত,
কবি ব'লে আখ্যা পাবার যোগ্য তো সেই ভাগ্যবন্ত ॥[৭]

স্মৃতির সঞ্চয় নিয়ে অনাদ্যন্ত পথে হেঁটে চলেন শিল্পী ; মানুষকে ভালোবেসে এবং নিজেকে ক্ষয় করে করে তাঁর অভিযাত্রা অন্তহীন লক্ষ্যের দিকে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে'। কিন্তু কবির ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা কেমন করে সৃষ্টির রূপ নেয়, একজন নিজেকে করে তোলেন দশজন, সেই রহস্য ভেদ করতে বসেন শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'কবিতার মুহূর্ত'-এ। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে অনুপুঙ্খ পাঠের পরও কি পাঠক গণিতের মত কাব্যের সব হিসাব মিলিয়ে নিতে পারেন ? কবির ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা শিল্পী-মানসের স্পর্শে যখন রঙিন তখন তার বর্ণাঢ্য রূপায়ণকে প্রতিটি কোণ থেকে নতুন বলে মনে হতে থাকে। প্রতিটি ভোক্তার মনই এক একটি অজ্ঞাত কোণ। সেই অজ্ঞাতের সংবাদ যখন শিল্পী রাখেন না সৃষ্টির মুহূর্তে, তখন সকলের কাছে না হলেও বহুজনের কাছে পেঁছে যাওয়ার জন্য নানা কৌশল নিতে হয় তাঁকে। কবি সর্বদা ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ পাবেন কি ? শঙ্খ বাবুও সে চেষ্টা করেছেন কি ? তাঁর সব কবিতার ব্যাখ্যা তো তিনিও করেন নি। বরঞ্চ পাঠকের কামনাকে উসকে দিয়ে তাকে আরও লোভী করে তুলেছেন। সব কবি সৎ হবেন সর্বদাই, এমন প্রতিশ্রুতিই বা কোথায় ? সুতরাং একজন কবি, নাম যার শঙ্খ, আর সকলের সত্তা ও সৃষ্টি-মুহূর্তের ব্যাখ্যার দায় তিনি যখন কোন ভাবেই একা নিতে পারেন না তখন সব কবির 'কবিতার মুহূর্ত' ব্যাখ্যার জন্য অপেক্ষা না করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাটা সব স্রষ্টার কাছ থেকে প্রত্যাশিত বলে ভাবা যেতে পারে।—'সবার আগে লেখক-কবিকে এই চিন্তাটা স্বভাবে পরিণত করতে হবে—আমি দশজনের একজন'। নিছক বহির্ঘটনা, মনের সাপেক্ষতা ব্যতিরেকে, যেহেতু সংবাদমাত্র, সাহিত্য নয় ; সুতরাং বস্তুবাদীও স্বীকার করেন যে 'স্রষ্টা' নামক 'দশজনের একজন' ব্যক্তিরূপে আহরণ করেন মাত্র, সৃষ্টির মুহূর্তে প্রয়োজন অন্য কিছু ; অন্ততঃ স্রষ্টারই মনের আর একটি স্তর। এই রহস্য ব্যাখ্যার জন্যই কীটস ব্যবহার করেন 'Negative Capability' কথাটি এবং এলিঅট ঘোষণা করেন 'Extinction of Personality'র প্রয়োজন। ঐ কর্মের যদি বিঘ্ন ঘটে 'দশজনের একজন' হওয়ার মুহূর্তে, তাহ'লে কি ব্যর্থ হয় না শিল্পীর সাধনাই ? সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, কীটস-এর 'Negative Capability'র ভাষান্তর করেছিলেন 'সাঙ্কেতিক আত্মহত্যা'। সুধীন্দ্রনাথের মতে

---

৬. 'শিল্প' : পারাপার। অমিয়কুমার চক্রবর্তী
৭. 'কবি' : তন্বী। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

'এই সাংকেতিক আত্মহত্যা'—শুধু কাব্যে নয়,যেখানে স্রষ্টা অনায়াসে সর্বগ, সর্বজ্ঞ এবং অনাসক্ত ঈশ্বর হতে পারেন সেই উপন্যাস বা নাটকেও প্রয়োজন। আর ঐ ভাবেই তিনি হয়ে ওঠেন 'দশজনের একজন'। 'দশজনের একজন' রূপেই একসময় তিনি 'সাময়িক জীবনের কষ্টিপাথরে' আপন যোগ্যতা কষে দেখেন, সক্রিয় হয়ে ওঠেন 'চারপাশের অবিচ্ছিন্ন জীবনের সঙ্গে প্রবহমান জীবনের সমীকরণ' করতে। ই. এম. ফর্স্টরকে স্মরণ করে সুধীন্দ্রনাথ বললেন, 'কালজ্ঞান ভিন্ন তার গত্যন্তর নেই'। সুতরাং স্ব-কাল সচেতন থেকেই অন্য দশজনের থেকে একসময় স্বতন্ত্র একজন হয়ে ওঠেন সাহিত্যিক। তাঁর সেই ব্যক্তিত্ব যেহেতু 'মহাকালের প্রসাদ চায়' তাই সমকালের প্রতি বিমুখমাত্রেই অনুগামীর চরণাহত'। কালান্তরে প্রবেশকামী কবি মাত্রই 'নিরবলম্ব নিরপেক্ষতা'কে সম্বল করেন কিভাবে, তা ব্যাখ্যাপ্রসংগে সুধীন্দ্রনাথের মনে পড়ল তাঁদের কালের প্রিয় কবি এলিঅটের 'Tradition and the individual talent' প্রবন্ধের কবি-ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিখ্যাত 'ক্যাটালিটিক এজেন্ট' কথাটি —'এলিঅট কবিকে ক্যাটালিটিক এজেণ্ট উপাধি দিয়েছেন'। সুধীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে যে মালার্মে-ভক্ত নিজেই তা স্বীকার করেছেন।

এলিঅট ছিলেন বিষ্ণু দে'র প্রিয়। এলিঅটের 'Extinction of Personality' তত্ত্ব বিষ্ণু দে মেনে নিলেন এই ভাষায়—'ব্যক্তিত্বের নির্বিশেষ সন্ধানের শেষ দেখি ব্যক্তিত্ব-বিলোপে'। 'ব্যক্তিত্ববিলোপ' বা 'সাংকেতিক আত্মহত্যা' বলতে বিষ্ণু দে বা সুধীন্দ্রনাথ যা বুঝতেন তা আসলে রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতিতে 'Individuality' কে গৌণ করে 'Artistic Personality'র গুরুত্বের স্বীকৃতি। প্রথমটি, এলিঅটের ভাষায়, 'The man who suffers' এবং দ্বিতীয়টি (Personality) 'the mind which creates.' ১৩৪৭-এর 'সাহিত্য-বিচার' প্রবন্ধে মোহিতলাল মজুমদার রবীন্দ্র-পন্থায় 'Individuality' এবং 'Personality'-র বিভাগকে স্বীকার করে নিয়ে বললেন, প্রথমটি 'উৎকৃষ্ট কবিকর্মের পরিপন্থী' এবং পার্সোন্যালিটি যা আসলে 'Genius of Humanity' তা 'সাধারণ মানব চরিত্রেরই এক ঘনীভূত বা প্রবলতর প্রকাশ'। এই পার্সোন্যালিটি 'নৈর্ব্যক্তিক' এবং 'রূপসৃষ্টি'র কর্তা। মোহিতলাল বলছেন, 'অতএব এই যে রূপসৃষ্টি, ইহার মূলে আছে প্রেম—কারণ এমন করিয়া দেখিতে বা দেখাইতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে 'আমি'-টাকে উৎসর্গ করিতে হয়।' মোহিত-লাল-কথিত কবি-র 'আমি'র উৎসর্গ ব্যাপারটিই কীটস বুঝিয়েছিলেন এইভাবে 'he has no Identity—he is continually in for and filling some other body।' আর এলিঅটের ভাষায় 'The progess of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extinction of personality।' কিন্তু এই সব সিদ্ধান্তের তাৎপর্য এই নয় যে, ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ চঞ্চল বহির্ঘটনা থেকে একজন শিল্পীর আহরণ অন্যায় বা অসঙ্গত। বরঞ্চ 'extinction of personality' অথবা কীটস-এর 'সাংকেতিক আত্মহত্যা'র সংগে কডওয়েল-এর 'Self-socialisation' এর মোটেও ভিন্নত্ব নেই। 'ব্যক্তিত্ববিলোপ' মানে সামাজিক সত্তা বা 'সমাজ মানস'-এর অস্বীকৃতি নয়। তাঁর ব্যক্তিত্বের বিলোপ যে-শিল্পকর্মে সেখানে সমাজনীতি-ধর্ম-দর্শন, জীবনানন্দের ভাষায়, 'এ সবই

রয়েছে কিন্তু তবুও এ সমস্ত জিনিস যেন এ সমস্ত জিনিস নয় আর'।[৮] হয়ত বিভ্রমের আশঙ্কাতেই মোহিতলাল 'পার্সোন্যালিটি'-র পরিবর্তে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন 'genius of humanity' কথাটি। বুদ্ধদেব বসু 'genius' শব্দে অলৌকিকতার আভাস পেতেন। সংস্কৃত শব্দ 'প্রতিভা' তাঁর কাছে genius থেকে পৃথক তাৎপর্যবহ ছিল। 'প্রতিভা', তাঁর কাছে, 'বুদ্ধির দীপ্তি' অথবা 'মেধা'র নামান্তর। মোহিতলাল 'genius' এর অর্থতাৎপর্য বুদ্ধদেবের ভঙ্গিতে গ্রহণ করেই কি স্রষ্টার যে-ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে তাকে 'genius of humanity' বলেছিলেন? ফলতঃ শব্দটি ব্যক্তিক সম্পদের দিকে ইঙ্গিত না করে বৃহত্তর মানবতার সামগ্রিক ঐশ্বর্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

॥ ঘ ॥

শিল্পী 'দৈবানুপ্রেরিত' অথবা 'সামাজিক' যাই হোন, রূপ রচনাই তাঁর প্রাথমিক এবং আবশ্যিক কৃত্য। রূপের আবেষ্টনে ভাবের মুক্তি ঘটিয়ে তিনি 'রূপকার' অথবা 'রূপদক্ষ' বা artist, 'রূপ' বলতে সাধারণে যার পরিচিতি তা বহিরাঙ্গিক বা External. কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্তি লাভ করার আগে Idea Content বা ভাববস্তুতে তার প্রারম্ভিক অস্তিত্বের যে সম্ভাবনা হেগেল-কল্পিত, ক্রোচের রূপকল্পনার সমাপ্তি সেখানেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে রূপের সামাজিকতার গুরুত্ব এত বেশী ছিল যে 'অ্যাবসোলিউট আইডিয়ালিস্ট' ক্রোচের সিদ্ধান্তের অনুকূল হওয়া সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। দ্বৈত-বাদী হেগেল-এর মতই ফর্মের Internal এবং External দ্বিবিধ অস্তিত্বেই তাঁর নির্ভরতা, যেহেতু তিনি ছিলেন স্রষ্টা, নিছক দার্শনিক ন'ন। বিষয়ের গরজে সাহিত্য-রূপের বৈকল্য ঘটতে পারে, এমন আশঙ্কা ১৩৩০-এর পর থেকে রবীন্দ্রনাথের মনে জেগেছিল বারবার। ১৩৩৫ এবং ১৩৩৮ সালে লেখা হয়েছিল যথাক্রমে 'সাহিত্য রূপ' ও 'রূপকার' প্রবন্ধ দুটি। দুই-এর মধ্যে ১৯৩০-এ সুধীন্দ্রনাথের 'কাব্যের মুক্তি'। সুধীন্দ্রনাথ বলছেন 'শব্দের অন্তঃশীল আবেগ, সমাবেশ ও ধ্বনি বৈচিত্র্য, এবং ছন্দের শোভনতা প্রভৃতি 'গুণ সমষ্টির নাম রূপ; এবং রূপের প্রত্যেক অঙ্গ অপরিহার্য'। দু' দশক পরে' 'কুলায় ও কালপুরুষ'-এর মুখবন্ধে মালার্মের ভাবশিষ্য পল ভালেরি-র দোহাই দেন, কোলরিজকে স্মরণ করেন—'কবিতা শ্রেষ্ঠ শব্দের সর্বোৎকৃষ্ট বিন্যাস'। কোলরিজ-এর Best words in best order'-এর বঙ্গান্তর শঙ্খ ঘোষ করেছেন 'শ্রেষ্ঠ শব্দের শ্রেষ্ঠ ব্যূহ'। শব্দানুশাসন, যে শব্দ প্রাচীনত্ব সত্ত্বেও 'কাব্যের বাধ সাধে না', কবিতায় অবশ্য-মান্য, যেহেতু কবিতা অদ্যাপি উক্তের চেয়ে অনুক্তের পক্ষপাতী। কবির 'কারয়িত্রী-প্রতিভা'র সাধ্য যদি হয় 'রূপ' তাহলে ভাষা তাঁর সাধন মার্গের সম্বল বৈ কি! এমন কি ভাষার চয়ন এবং নির্মাণও এক সময় প্রাতিভ শক্তি-নির্ভর হয়ে পড়ে। সুধীন্দ্রনাথ স্মরণ করলেন অ্যারিস্টটলকে—

৮ কবিতার কথা : ১৩৪৫

এমন কি অ্যারিস্টটল সুদ্ধ মানতেন যে বিসদৃশের মধ্যে সাদৃশ্যের সন্ধান যে কবির ক্ষমতায় কুলায় না, সে প্রতিভায় বঞ্চিত।[৯]

সুধীন্দ্রনাথ এখানে Metaphor বা রূপক অলঙ্কার প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলের উক্তি স্মরণ করেছেন। Metaphor-এর সর্বশ্রেষ্ঠ (এবং হয়ত সর্বপ্রথম) ব্যাখ্যাতা অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, এর ব্যবহার বিধি কেউ কখনও অপরের কাছ থেকে শিখতে পারে না। অপূর্ববস্তু নির্মাণ ক্ষমতা, যাকে বলে প্রতিভা, তার রহস্য ধরা পড়ে 'মেটাফোর' ব্যবহারের মধ্যে। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, 'মেটাফোর'-এর মধ্যে যে স্থান পরিবর্তনের কথা আছে তার তিনটি বিভাগ—জাতির স্থলে প্রজাতি (Speceis for genus) প্রজাতির স্থলে জাতি (Genus for Species) এবং এক প্রজাতির স্থলে অন্য প্রজাতি (Species for species)। কিন্তু সকলেরই মূল কথা বিসদৃশে সাদৃশ্য কল্পনা।

বাণীশিল্প সাহিত্যে সাধারণভাবে শব্দেরই আধিপত্য; রূপ তার শব্দে সমর্পিত, গদ্য-পদ্যের সাম্প্রদায়িক ভেদভাব সেক্ষেত্রে মিথ্যা। কবিতার ভাষারূপের বিশিষ্টতা অবশ্যগ্রাহ্য হলেও সাহিত্য নামক শিল্পে উক্তিই উপলব্ধি প্রকাশের একমাত্র উপায়। ১৯৫৩-তে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন[১০], 'কাগজ-কলম নিয়ে বসতেই দেখলুম যে ক্রোচে-প্রস্তাবিত উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত অক্ষরে অক্ষরে সত্য।' ক্রোচের Intuition-এর বঙ্গান্তর করা হয়েছে 'উপলব্ধি' এবং 'Expression'-এর 'উক্তি'। ক্রোচে তাঁর 'Aesthetic' গ্রন্থে বলেছেন:

> It is impossible to distinguish intuition from expression in this cognitive process. The one appears with the other at the same instant, because they are not two, but one.[১১]

Intuition বা কোন বস্তুকে কেন্দ্র করে মনের মধ্যে অখণ্ড মূর্তিতে উদ্ভাসিত রূপ এবং সেই রূপের Expression বা প্রকাশ-মুহূর্তের মধ্যে পার্থক্য, ক্রোচের মতে, অকল্পনীয়। ভাবের রূপ পরিগ্রহ বলতে ক্রোচে বুঝতেন যে-রূপে ভাব অন্তর্লোকে উদ্ভাসিত হয়েছে তাকেই। সেই কারণেই যে বাহ্যরূপ এক শিল্পকর্মকে পৃথক করে অন্য শিল্পকর্ম থেকে, ক্রোচে তার সার্থকতা মানতেন না। কৌশল, তাঁর বিচারে, কলা-চর্চার অন্তরঙ্গ অপরিহার্য উপাদান নয়। ক্রোচে 'টেকনিক'কে এবং সেই কারণে 'কম্যুনিকেশন' নিয়ে ব্যস্ত হওয়াকে বরদাস্ত করতে পারতেন না। অন্যদিকে ফোলকেল্ট, ডেসোয়ের এবং তাঁদের মত অনেকে ক্রোচের এই অবাস্তব প্রস্তাবকে পরিহাস করেছেন। এই সব তত্ত্বকে তাঁরা 'obscurity'-র দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ ক্রোচেকে সমর্থন জানিয়েছিলেন 'উক্তি' কথাটি বহিরঙ্গ 'Expression' অর্থে ধ'রে নিয়ে। রূপকে যে ঘসে মেজে শিল্পীর মনের মত করে নিতে হয় এবং তা যে শিক্ষা ও বারংবার চর্চার উপর নির্ভরশীল তা ক্রোচে বিস্মৃত হলেও সুধীন্দ্রনাথের বিস্মৃত হওয়া অলীক ব্যাপার।

৯. 'কুলায় ও কালপুরুষ' এর মুখবন্ধ।

১০. 'সংবর্ত'-এর ভূমিকা।

১১. *Aesthetic.* Translated from the Italian by Douglas Ainslie. Rupa & Co. P. 9

দার্শনিক ক্রোচে 'টেকনিক' এবং 'কম্যুনিকেশন'-কে উপেক্ষা করে 'ফর্ম'-এর অপরিহার্য-তার কথা বললেও 'ফর্ম' ও 'টেকনিকে'র কার্য-কারণ সম্পর্ক অবশ্যই মানতেন সুধীন্দ্রনাথ। সুতরাং 'ভাব' ও 'প্রকাশের' অন্তরঙ্গতা বোঝাতে সুধীন্দ্রনাথ ক্রোচের দোহাই দিলে তা স্বস্তিদায়ক হবে কি ?

'রূপ' এবং সেইহেতু টেকনিকের প্রতি অতি মনোযোগের দক্ষিণপন্থী বিকার এবং অমনোযোগের বামমার্গী অজ্ঞতা কাব্যবোধে কতটা প্রতিবন্ধক তা বিষ্ণু দে এবং বুদ্ধদেব বসু বুঝতে ভুল করেন নি। বুদ্ধদেব বললেন, 'কলাকৌশলকেই কলাকৈবল্য বলে গ্রহণ করে ইংলন্ডের নব্বুই যুগের সমালোচনা যেমন ভুল করেছিল, তেমনি বা হয়তো তার চেয়েও মারাত্মক ভুল করেছে এ যুগের একশ্রেণীর সমালোচনা উপাদানকেই সর্বস্ব বলে ভেবে'।[১২] বুদ্ধদেব 'কলাকৌশল' বা টেকনিককে সর্বস্ব ভাবেন নি যুক্তিসংগত কারণেই। রবীন্দ্রনাথ একদা একেই বলেছিলেন, সাহিত্যজগতের 'পূর্তবিভাগ'। কুশলী ন'ন এমন কারুকে শিল্প-সাহিত্যের জগতে কেউই শ্রদ্ধা করি না। কিন্তু লিখতে জানলেই যদি কেউ লেখক হতেন তাহ'লে আড়তদারের কেরানীও সাহিত্যিক হতেন। হিসেবের খাতায় কালীকীর্তন লিখে একালের রামপ্রসাদ রেহাই পেতেন না অথবা হিসেবের খাতা যাঁরা লেখেন তাঁরাও তো সবাই রামপ্রসাদ ন'ন। *The Waste Land*-এর লেখক এলিঅট ব্যাঙ্কে মোটা মাইনের চাকরী করতেন, কিন্তু তাঁর অফিসের কাজের সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টির পার্থক্যটা ছিল পরিমাণ গত নয়, গুণগত। সাহিত্যকর্ম একটি বিশেষ কৌশলের ব্যাপার। তবে শুধুই কৌশলের গুণে সাহিত্য জন্ম নেয় না। বুদ্ধদেব য়ুরোপীয় কলাকৈবল্য-বাদীদের সীমার দিকটা নির্ভুল দেখিয়েছিলেন। কিন্তু কলাকৈবল্যবাদীরা, তাঁদের প্রচুর সমালোচনা সত্ত্বেও অদ্যাপি বস্তুবাদীদের শক্তিশালী বিরোধীপক্ষ। প্লেখানভের 'আর্টের জন্য আর্ট মানে অর্থের জন্য আর্ট,' এতবড় শ্লেষ সত্ত্বেও এখনও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কলা-কৈবল্যবাদীরা দিব্বি আছেন এবং অনাগতে তাদের সুনিশ্চিত অপঘাত সম্পর্কে নিঃসংশয় কি কেউ ? অন্য আর এক ভ্রান্ত পথের পথিকদের কথাও বলেছেন বুদ্ধদেব। এঁরা 'উপাদান' কেই সর্বস্ব ভাবেন। সাহিত্যের উপাদান নিঃসন্দেহে সাহিত্যের অনেকখানি অংশ, যেমন মানব দেহের ক্ষেত্রে অস্থি-মজ্জা-চর্ম ইত্যাদি। কিন্তু অস্থি-মজ্জা-চর্ম একত্র করলেই কি রূপ ফুটে ওঠে ? সাহিত্যের উপাদান যদি হয় দৈনন্দিন গদ্যময় জীবনের খন্ডাংশ, এবং সেই জীবনের গঠনে অপরিহার্য অর্থনৈতিক কোন জটিল প্রক্রিয়া, তাহ'লে তাকে কে মানবে সাহিত্য বলে, যদি না তা সাহিত্যের নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করে ? মার্কস এবং এঙ্গেলস উভয়েই এক সময় কোন এক গ্রন্থ সমালোচনাকালে[১৩] ভাষা-ছন্দ ইত্যাদি বাহ্য-রূপের আলোচনাকে 'side issues' বলে উপেক্ষা করেছিলেন এবং গুরুত্ব দিয়েছিলেন বাস্তব ঘটনার নির্ভুল উপস্থাপনার উপর। 'কলাকৈবল্য' বাদীদের মত 'কলাকৌশলে' বাঁধা পড়লে যে বিপদ, কলাকৌশলের প্রতি উপেক্ষা তার চেয়ে কম বিপজ্জনক নয়; কারণ নান্দনিক

১২. সাহিত্যচর্চা। পৃ—১৫১-৫২
১৩. ফার্দিনার্দ দ্য লাসাল—Franz Von Sickingen

ব্যাপারে যে কোন রকম অতিরেকই দোষাবহ। সুতরাং বাহ্যরূপ সম্পর্কে মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে আর এক ধরনের বৈকল্য সৃষ্টি করতে পারে। তা হল বিষয়সর্বস্বতা। বুদ্ধদেব বসু-র উক্তির শেষ দিকে সে রকম একটি ইঙ্গিত ছিল। বুদ্ধদেব বসু কটাক্ষ হানলেন যাদের দিকে, এবং হয়ত তা অসংগতও নয়, বিষ্ণু দে তাঁদেরই ভ্রান্ত মার্কসবাদী বলতে চাইলেন :

> টেকনিকের সাধনাই শিল্পীকে জিজ্ঞাসার সীমান্তে টেকনিকের উৎসে নিয়ে যেতে পারে। রচনার পদ্ধতি চৈতন্যমার্গ বা বিশ্বাসের বিরোধী, একথা শুধু অতিবামপন্থীদের মনেই ওঠে।[১৪]

মার্কসবাদীদের মধ্যে এই রকম ব্যাধির তাড়না আসতে পারে বুঝেই কন্‌স্তান্তিন ফেদিন ১৯৫৩-এ মাঝারি আকারের একটি প্রবন্ধ লিখলেন, যার শিরোনাম ইংরেজিতে করা হয়েছে 'On Craftsmanship'. ফেদিন বলছেন, 'When craftsmanship is not at the service of great content, it is fraud', এবং 'True craftsmanship does not cloud the essence of thought.' বিষ্ণু দে বলছেন, কাব্য গোপন তন্ত্রমন্ত্র নয় 'কাব্য সম্বোধন' এবং এই সম্বোধনে শ্রোতার সঙ্গে সম্পর্ক অবশ্য গ্রাহ্য। তাই তাঁর বিবেচনায় সাহিত্যে 'টেকনিকে'র গুরুত্ব অবশ্যই মান্য। ফরাসী ভাস্কর রদ্যাঁ র(Rodin) কথা তুলে অবনীন্দ্রনাথও এসেছিলেন অনুরূপ সিদ্ধান্তে—'শিল্প রচনায় টেকনিক মর্যাদা পায় যান্ত্রিকতা থেকে রচনাকে বাঁচায় বলে।' যে-কোন শিল্প রচনাই যান্ত্রিক প্রথাবদ্ধতার ফাঁস কণ্ঠে ধারণ করতে অনিচ্ছুক। এক তাল মাটি নিয়ে রদ্যাঁ যখন বানাতেন পুতুল; অথবা অবনীন্দ্রনাথ অনাদৃত কাঠের টুকরো নিয়ে, পাতা থেকে রঙ-রস নিঙড়ে গড়তেন মূর্তি তখন কি তাঁরা নিজেদের দায়বদ্ধ করে রাখতেন কোন প্রথার কাছে? তাহলে এমনটি ঘটত যে, একজন কবি সারাজীবন একই রকম কবিতা লিখে যাচ্ছেন। কালান্তরে ভাবের বদলের সঙ্গে রূপের এবং কলাকৌশলের বদলও অনিবার্য। তাই 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর'-এ বুদ্ধদেব যে প্রকরণে অনুরক্ত, 'স্বাগত বিদায়'-এ তা নয়। দুটি কাব্য থেকে একটু উদাহরণ :

১. প্রতীক্ষা কিসের?

প্রতীক্ষা প্রেমের। কে প্রতীক্ষা করে? যে প্রতীক্ষা করে সে-ও প্রেম।

প্রথম পঙক্তিতে যে প্রশ্ন দ্বিতীয় পঙক্তির প্রথমে তার উত্তর দিয়ে পূর্ণচ্ছেদ। পুনরায় দ্বিতীয় পঙক্তিতে প্রশ্ন এবং উত্তর দিয়ে পূর্ণচ্ছেদ। একই পঙক্তিতে দুটি পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহারের যে 'টেকনিক' তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশী নয়।

২. 'স্বাগত বিদায়'-এর নীচের পঙক্তিগুলি প্রশ্নোত্তরের তরঙ্গ ভঙ্গে বিন্যস্ত নয়। প্রশ্ন এবং প্রশ্নই এই অংশের নতুন কৌশল :

যে-আমি আমার মনে, তার কি অস্তিত্ব নেই আর?
আমারও কি মুহূর্তে-মুহূর্তে মৃত্যু; 'আছি', 'নেই' — সীমানাও স্পষ্ট নয়?

১৪ 'বাংলা সাহিত্যে প্রগতি'—সাহিত্যের ভবিষ্যৎ। ভারবি-পৃ. ১০

কিন্তু, দ্যাখো, আমি নই মৃত।
তাহ'লে
এই যাকে আমি বলি আমি
সে
কে ?

আসলে বিচিত্র কৌশলে নানা ছাঁদে কাব্যপঙক্তির যে বিনোদ বেণী রচনা চলে তার উপর সমালোচকের নির্ধারিত নিয়মের কোন নিয়ন্ত্রণই নেই। টেকনিকে প্রথার শাসন যখন আসে তখন যান্ত্রিকতা অনিবার্য। উচ্চাঙ্গের ভাব ও বিষয়ের কবিতা অনেক সময় যান্ত্রিক টেকনিকের আঘাতে বদ্ধ জলায় পাক খায়। কলাচর্চায় কৌশল অপরিহার্য—এর মানে এই নয় যে 'কৌশল'ই 'কলা'। সাহিত্যিকের কৌশল প্রকাশিত রূপের মধ্যেই সর্বোত্তম রূপে বাঙময়। এই 'রূপ ফোটানো ক্রিয়াটি' অবনীন্দ্রনাথ বলতেন, 'নানা প্রথা প্রকরণে শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারায় সুনিষ্পন্ন করে শিল্পী।' যে কারণে সকলেই কবি হন না, হন কেউ কেউ, তা হল 'ভাবপ্রতিভা'কে অবনীন্দ্রনাথ-কথিত 'প্রথা-প্রকরণে শিক্ষা ও অভ্যাসের' সহায়তায় সৃষ্টিমুখী করে তোলার সামর্থ্য এবং সক্রিয়তা। সুতরাং সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাব-প্রতিভার যেমন অপরিসীম গুরুত্ব তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার প্রথাপ্রকরণে শিক্ষা ও অভ্যাস। ভাবপ্রতিভা যদি ব্যক্তিক হয়ও তথাপি ফর্ম রচনায় টেকনিকের ভূমিকা ব্যক্তিক হয়েও সর্বভূমিন, নইলে একের কবিতা অপরকে প্রাণিত করে কি করে? আরাগঁ-র 'এক নম্বর নরখাদক' নামক পুস্তিকায় 'আত্মহত্যা' নামক কবিতাটি তো ছিল A থেকে Z পর্যন্ত ইংরেজি অক্ষর মালার পঙক্তিবিন্যস্ত রূপ। সেটি যে কবিতা নয় তা আরাগঁ-র থেকে বেশী আর কে জানতেন? আসলে অন্তরের অন্দর মহলে ভাবের জন্মই কবিতা, তার কোন দায় নেই এমন কি বক্তব্য প্রকাশ বা কম্যুনিকেশনের দায়ও না—এই বিশ্বাসে আস্থিত এক বিশেষ শ্রেণীর জন্যই এমন বিদ্রূপ করেছিলেন আরাগঁ[১৫]। মোট কথা বিষয় বস্তুর প্রতি মোহ অথবা কলাকৌশলে মোহ যাবতীয় মোহের স্বাভাবিক পরিণতি আহ্বান করে আনে।

'সৃষ্টি' হল বিশেষ কোন রূপে সৃষ্টি, স্রষ্টা সেখানে সমর্পিত-চিত্ত। কিন্তু 'রূপ'—যা লেখক ও পাঠকের মধ্যে সংযোগ সাধন করে—উৎকৃষ্ট সাহিত্যের প্রথম কথা মাত্র! মোহিতলাল বলেছেন, রূপ পিপাসায় কিছুই সৃষ্টি হয় না, তা ইন্দ্রিয়-বিলাসের নামান্তর মাত্র। রবীন্দ্রনাথ 'আর্টিস্ট'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'রূপদক্ষ' কথাটি পছন্দ করতেন। কিন্তু তাঁর মতে রূপের সার্থকতা রসসৃষ্টির সাফল্যের মধ্যে। মোহিতলাল বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রতিধ্বনি করে যে, রূপ-পিপাসা থেকে 'উৎকৃষ্ট আর্ট' হতে পারে, 'উৎকৃষ্ট সাহিত্য' নয়। 'উৎকৃষ্ট সাহিত্য' হল 'কায়া-কান্তি'র অভিন্ন মূর্তি। মোহিতলাল 'আর্ট' এবং 'সাহিত্য' কথা দুটির মধ্যে যে পার্থক্যের কথা বলছেন তা কিন্তু Genus

---

১৫. আরাগঁ-র এই তথাকথিত কবিতাটি সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া গিয়েছে বিষ্ণু দে-র 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' গ্রন্থে।

এবং Species-এর পার্থক্য নয়। 'সাহিত্য' যদি Species হয়, তাহ'লে আর্ট তার Genus। আর্টের বিভিন্ন শাখার অন্যতম হল 'সাহিত্য'। কিন্তু মোহিতলাল এখানে আর্ট বলতে কলাকৌশলে সমৃদ্ধ রচনা বুঝিয়েছেন। 'আর্ট' শব্দটা ব্যাপকার্থবহ। ভালো বক্তৃতা করা, কবিতা লেখা থেকে শুরু করে তেমন করে হাঁটতে পারাটাও আর্টিস্টিক হতে পারে। ভালো নাটক লেখা যেমন আর্টের ব্যাপার, ভালো অভিনয় করাটাও তাই। আর্ট-এর অর্থগত এই পরিসরের কথা ভেবেই মোহিতলাল বললেন যে, রূপ-পিপাসা থেকে আর্ট জন্মাতে পারে; কিন্তু 'সাহিত্য' হল কায়া ও কান্তির অভিন্ন মিলন। 'কান্তি'র অন্যতম ইংরেজি প্রতিশব্দ, মোনিয়ের উইলিয়মস-এ, 'Beauty'। সুতরাং শুধু 'দেহ' নয়, সৌন্দর্যযুক্ত দেহ হল কায়া-কান্তি। কিন্তু সৌন্দর্য কাকে বলে সমস্যা সেখানে। ভাববাদী, বস্তুবাদী, অতীন্দ্রিয়বাদী সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এক এক রকম ভাবে। যে-শব্দের একটি মাত্র অর্থ নির্দিষ্ট নেই, যে-শব্দের ব্যবহার নিরাপদ নয়। আনাতোল ফ্রাঁস বলেছিলেন, 'I believe that we shall never know exactly why a thing is beautiful'। 'Beauty' অর্থে 'সৌন্দর্য' 'চমৎকার' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা। চতুর্দশ শতকে নারায়ণ নামক একজন ভারতীয় আলঙ্কারিক 'চমৎকার' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন 'চিত্তবিস্তার' অর্থে। তাঁর আগে কুন্তকাচার্য 'সৌন্দর্য' বোঝাতে 'চমৎকার' শব্দের প্রয়োগ করেছিলেন। সুন্দর-বস্তু চিত্ত-বিস্তারক বা মনের বিস্তার ঘটায়। সুতরাং কায়া-কান্তির তাৎপর্য এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—শব্দার্থের দেহবিশিষ্ট কাব্য যখন পাঠক মনের বিস্তার ঘটায় তখনই তাকে বলে সুন্দর। অতএব অর্থবহ শব্দের সুচারু বিন্যাসই সাহিত্য নয়, পাঠক মনে তার প্রভাব বিস্তার ক্ষমতাও বিচার্য। এ যেন ধ্বনি-কার-কথিত 'লাবণ্য-মিবাঙ্গনাসু'। 'কান্তি' শব্দের প্রয়োগ মুহূর্তে মোহিতলালের মনে কি ছিল ভারতীয় আলঙ্কারিকদের 'কান্তি' গুণ কথাটি? আচার্য দন্ডী যে দশটি অর্থগুণের কথা বলেছিলেন তার দশমটি হল 'কান্তিঃ'। 'কান্তিঃ—দীপ্ত রসত্বং।—দীপ্তাঃ রসাঃ শৃঙ্গারাদয়ো যস্য স দীপ্ত রসঃ। তস্য ভাবো দীপ্ত রসত্বং কান্তিঃ।' অর্থাৎ শৃঙ্গার প্রভৃতি দীপ্ত বা উজ্জ্বল রস যেখানে আছে সেখানে 'দীপ্ত'রসের প্রকাশ। এরই ভাব হল দীপ্ত রসত্ব, স্পষ্ট প্রতীয়মানত্ব। বামনাচার্যও কান্তি-হীন কবিতাকে উজ্জ্বল্যহীন ছবি বা পুরাণ-ছায়া বলেছিলেন—কান্তি বিপর্যয়ঃ পুরাণী-চ্ছায়া। রসের প্রসঙ্গ যদি কান্তি-গুণের আলোচনায় বিবেচিত হয়, তাহ'লে মোহিতলালের 'কায়া-কান্তি'র অর্থ দাঁড়াবে 'রূপ-রস'। 'রস' শব্দের পারিভাষিক অর্থ-তাৎপর্য বঙ্কিমের কাল থেকেই বর্জিত। 'রস' শব্দে মোহিতলাল বুঝতেন—'বিশেষের রূপেই আমরা যাহা আস্বাদন করি'। অর্থাৎ রূপ ও রসের পরস্পর-সাপেক্ষতাই মোহিতলাল-কথিত কায়া-কান্তি। মোহিতলাল ভারতীয় আলঙ্কারিকদের conventional আর্টবাদ-কে অস্বীকার ক'রে নূতন রসতত্ত্বের সূচনা ও পরিণতি লক্ষ্য করেছিলেন শোপেনহাওয়ার এবং ক্রোচের মধ্যে।

॥ ঙ ॥

অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শিল্পীর কাজ হল রূপ-ফোটানো এবং 'রসগছানো'। নিঃসন্দেহে ভাববাদী এবং বস্তুবাদী দু'পক্ষই শিল্পীর প্রথম কাজ যে রূপ ফোটানো তা মানেন, যেহেতু শিল্প-সাহিত্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ-নির্মিতি। এঁদের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির দ্বন্দ্বাত্মক পরিণতি রূপ-নির্মাণ বিষয়ে মনোযোগের ঐকান্তিকতার প্রশ্নে। এলিঅটে প্রীতি এবং মার্কসবাদ-চর্চা যাঁর কাছে নির্দ্বন্দ্ব সহাবস্থান করেছে সেই বিষ্ণু দে'র-মত বিষয় বা বস্তুসত্তার প্রতি নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির সমর্থন এবং জিজ্ঞাসার সীমান্তে উপস্থিত হওয়ার জন্য টেকনিকের সাধনার উপযোগিতাকে মেনে নিতে সক্ষম নন সকলেই। নন্দন-তত্ত্বের জগতে দুই বিবদমান গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের হেতু বিষয় অথবা টেকনিক যে-কোন একটির উপর অযৌক্তিক গুরুত্ব আরোপ। বিশেষ টেকনিকের সহায়তায় 'রূপফোটানো' কর্মটি হয়ত নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু 'রস গছানো'? তাঁর নিজস্ব ঢঙে অবনীন্দ্রনাথ বললেন, 'রসের দিক থেকে অনুপ্রাণিত হল যে রচনা তাই হল আর্ট, রসের অবর্তমানে রচনাটি হল কষ বা নো আর্ট'। পুনশ্চ, 'রসের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হল তবেই' যখন শিল্পী ও সমজদার পরস্পরকে যথাযথ পেলেন। পারিভাষিক অর্থে 'রস' শব্দের ব্যবহার বঙ্কিমের সময় থেকেই বর্জিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবনের উপান্ত পর্বে অমিয়চন্দ্রের কাছে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'কে কাব্য সম্পর্কে পরম সত্য বলে গ্রহণ করলেন প্রাচ্য আলঙ্কারিকদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে। রবীন্দ্র-বিরোধীদের 'রস' শব্দে যে বিরাগ ছিল তাঁর নিদর্শন এঁদের অন্যতম মুখপাত্র শরৎচন্দ্র-কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত 'রসোদ্বোধন' শব্দটিকে 'ধোঁয়াটে' বলে তিরস্কারের মধ্যে। অথচ কিছু পরে শরৎচন্দ্র নিজেই 'রস' শব্দটি ব্যবহার করলেন নব্যতন্ত্রীদের সংকীর্ণ মানসিকতার সমালোচনা কালে। অদ্যাপি 'রস', 'রসোত্তীর্ণ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে আমরা অভ্যস্ত। পাছে এই শব্দে বিভ্রান্তি ঘটে তাই মোহিতলাল বললেন, 'ইহাতে রসশাস্ত্রীদের উৎফুল্ল হইবার কারণ নাই—'রস' বলিতে এখানে সেই বস্তুই বুঝিতে হইবে বিশেষের রূপেই আমরা যাহা আস্বাদন করি'। আদৌ 'রস' শব্দে আস্বাদন বোঝানো হয়েছে ( ভরত থেকেই, ) এবং 'রস শব্দটি সেই অর্থে গৃহীত হলে তার ব্যবহারযোগ্যতা এখনও অশেষ। কিন্তু শব্দটিকে কেন্দ্র করে অপ্রাকৃত ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, যেমন উঠেছে 'প্রতিভা'র চতুষ্পার্শ্বে। 'রস' যদি হয় আস্বাদন এবং আনন্দ-স্বভাব তাহ'লে বস্তুবাদীও প্রত্যাখ্যান করেন না তাকে। কিন্তু যে-মুহূর্তে আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হয় 'লীলা' শিল্প-রচনার আবেগ ও সাফল্য তুল্য হয় বিশ্বরচনায় মূলীভূত কারণের, তখনই জাগে সমস্যা।

বাঙলা সাহিত্যতত্ত্বে, সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যবহার করেন 'লীলা' শব্দটি, আপত্তি জানান 'খেলা' ও 'লীলা'র অভেদ কল্পনার বিপক্ষে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ 'লীলা' ও 'খেলা' একই অর্থে ব্যবহার করেছেন শিল্পের জগতে, যেমন করেছেন প্রমথ চৌধুরী। 'খেলা' প্রয়োজনাত্মক, দৈহিক বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য, সুতরাং অহৈতুক আনন্দ বোঝাতে 'লীলা'ই উদ্দেশ্যসাধক শব্দ। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ যখন বলেন

'আর্টিস্টরা ভক্তরা কবিরা পরম সুন্দরের সঙ্গে সুন্দর সুন্দর খেলা খেলেন' অথবা প্রমথ চৌধুরী বলেন, 'কবির সৃষ্টিও এই বিশ্বসৃষ্টির অনুরূপ, সে সৃজনের মূলে কোনো অভাব দূর করার অভিপ্রায় নেই—সে সৃষ্টির মূলে অন্তরাত্মার স্ফূর্তি এবং তার ফুল আনন্দ। এক কথায় সাহিত্যসৃষ্টি জীবাত্মার লীলামাত্র এবং সে লীলা বিশ্বলীলার অন্তর্ভূত'; তখন 'ভক্ত', 'পরম সুন্দর', 'জীবাত্মা' প্রভৃতির সঙ্গে 'লীলা' শব্দটি অপ্রাকৃত ভাবনার ইঙ্গিতবাহী হয়ে ওঠে। কিন্তু 'লীলা' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে ব্যবহার করেছিলেন, আমরা লক্ষ্য করেছি, তার সঙ্গে কান্ট, শিলার অথবা স্পেন্সরের 'Theory of play' বা খেলা-তত্ত্ব অভিন্ন, যদিও 'খেলা' শব্দটি ভিন্নার্থে ব্যবহারে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরীও 'খেলা' অথবা 'লীলা' শব্দটি যখন ব্যবহার করেন তখন পূর্বোক্ত পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদেরই পন্থানুসারী ছিলেন। শিল্পীকে লীলাময় ঈশ্বরের সঙ্গে একাকার করার এই ভাববাদী প্রবণতায় আঘাত আসে যখন মার্কসীয় দর্শনে প্রত্যয়ী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'লেখক কে? পিতার মতো যিনি দেশের মানুষকে সন্তানের মতো জীবনাদর্শ বুঝিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করার ব্রত নিয়েছেন'; অথবা, 'লেখক নিছক কলম-পেষা মজুর।' 'লীলাময়' এবং 'মজুর' শব্দ দুটির তাৎপর্যগত পার্থক্য নিশ্চয়ই মেরুপ্রান্তিক। শব্দ দুটি শিল্পীর অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রানুসারী ভাববাদীদের সঙ্গে বস্তুবাদী নন্দনতত্ত্বের যতটা বিকাশ হয়েছিল এদেশে, তার পার্থক্যের মূলে উপস্থিত করে। তবে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন অথবা মাও, শিল্পীদের কখনও 'মজুর' বলেন নি। শব্দটা মানিকের নিজস্ব এবং কিছুটা তর্কের ঝোঁকে উচ্চারিত। নতুবা তিনি কি জানতেন না যে, যথার্থ শিল্পী স্বাধীন এবং অর্থের বিনিময়ে তাঁর শিল্প-সৃষ্টির শ্রমকে বিক্রী করেন না? তিনি অবশ্যই জানতেন যে, বুর্জোয়ারা তাদের অন্যান্য লাভজনক উৎপাদনের মতই সাহিত্যকে ব্যবহার করতে চেয়ে সাহিত্যিকদের পরোক্ষে বৃত্তিভোগী কর্মচারীতে পরিণত করতে চান। তথাপি 'মজুর' শব্দটি ব্যবহার করলেন সাহিত্যিককে দায়মুক্ত স্বেচ্ছাবিহারী মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করার ভাববাদী প্রবণতায় আঘাত করার জন্য। মানিকের এই ঘোষণাকে আর একটু স্পষ্ট করে বোঝার জন্য হয়ত রমাঁ রল্যাঁ-র স্বারস্থ হওয়া যেতে পারে। লেখকদের কলম-পেষা মজুর বলে মানিক নিজেও বলেছিলেন যে, মজুরদের একজন হওয়া যায় তাদের স্বার্থ সিদ্ধিতে সহায়তা করে। রল্যাঁ স্পষ্ট করে যা বললেন; মানিকের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তার ঐকাত্ম্য প্রত্যক্ষ :

> শ্রমজীবীদের পাশে আমাদের স্থান। তাদের দেহ থেকে আমাদের জন্ম, তাদের স্বাধীনতা আমাদের স্বাধীনতা, তাদের শক্তি আমাদের শক্তি। তারাই গাছের মূল কান্ড; বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প অঙ্গগুলি বিভিন্ন শাখা মাত্র।... বুদ্ধিজীবী সুবিধাভোগী শ্রেণী। শোষণকারীরা তাদের যে সম্মান ও সুযোগ সুবিধা দেন তাতেই কৃতার্থ হয়ে তারা সাধারণের আদর্শের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে।

রল্যাঁ-র এই মন্তব্যে আর মানিকের কিছুটা হঠোক্তিতে কিন্তু মূল সুরটা একই। তা হল শৈল্পিক কমিটমেন্ট ( Commitment )-এর। সব শিল্পী-সাহিত্যিকই তো 'কমিটেড'; যেহেতু 'কমিটমেণ্ট' হল 'a choice of position'। পক্ষপাতিত্ব—যে শিবিরেরই হোন তিনি—শিল্পীর অনিবার্য নিয়তি; নয়ত শিল্প হবেই হবে ব্যক্তিত্বহীন, স্বাতন্ত্র্যবর্জিত এবং চর্বিত চর্বণ মাত্র। মানিক এবং প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হয়েছে যাঁর নাম সেই রল্যাঁও বলেছেন শিল্পী-সাহিত্যিকের শ্রমজীবীর স্বার্থে 'কমিটেড' হতে। এঁদের পক্ষে অন্ততঃ বিশ্ববিজয়ী দুটি নামের উল্লেখ করা যেতে পারে; একজন বার্নার্ড শ,' অপরজন জাঁ পল সার্ত। শ' বলেছিলেন, যে ব্যক্তি শিল্পেই শিল্পের চূড়ান্ত সিদ্ধি সন্ধান করে সে নির্বোধ এবং অনন্ত নরক যন্ত্রণা তার জন্য বরাদ্দ। একজন মানুষের পক্ষে একই সঙ্গে নির্বোধ এবং দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ক্ষমতাবান শিল্পী হওয়া সম্ভব, যেমন থ্যাকারে ..। সার্ত বললেন, বুর্জোয়াতন্ত্রের লেখকেরা জীবন থেকে সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে রসনা-রুচি-কর লেখা লেখেন এবং পাঠকদের স্বাধীন বিচারক সত্তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে নিজেরা তিনটি কর্মে নিযুক্ত থাকেন—রণ, রমণ ও ভ্রমণ। ইউরিপাইদস্-এর *The Trojan Women* অবলম্বনে সার্ত ঐ নামে একখানা নাটক লিখেছিলেন।* ঐ নাটকের মুখ-বন্ধে সার্ত লিখছেন—এই নাটকের একটি রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। সাধারণভাবে এ হল একখানা যুদ্ধবিরোধী নাটক, লেখা হয়েছিল আলজীরীয় যুদ্ধের সমকালে। আমরা জানি আজকের যুদ্ধ আণবিক যুদ্ধে রূপ নেবে, যার পরিণতিতে আক্রমণকারী ও আক্রান্ত কেউই জীবিত থাকবে না। এই নাটক বুঝিয়ে দেবে যে, যুদ্ধ হচ্ছে মানবতার ধ্বংস। গ্রীকেরা ট্রয় ধ্বংস করেছিল, কিন্তু লাভবান হয় নি।···তারপর নিজের নাটক সম্পর্কে সার্ত বললেন, এই নাটকের 'মেসাজ' হল—'that men should avoid war.' এটাই তো বুর্জোয়া-তন্ত্র-বিরোধী সার্ত-এর নিজস্ব 'কমিটমেন্ট'-এর ক্ষেত্র থেকে (যদিও অনুচ্চারিত) সাহিত্যিক বক্তব্যরূপে অন্তর্নিহিত বক্তব্য। সার্ত ঠিকই বলেছেন, যা তাঁর সাহিত্য-কর্ম এবং মানিকের গল্প সাহিত্যেও প্রযোজ্য—তাহ'ল, একজন লেখক তাঁর বলা এবং না-বলা বাণী দিয়ে যা রচনা করেন তার চতুর্দিকে ব্যঞ্জনাগর্ভ নৈঃশব্দ্য; এবং সেই নৈঃ-শব্দ্যের অতল অন্ধকার থেকে কিছু জন্ম নেবে না যদি-না পাঠক সমর্পিত-চিত্ত হয়ে কিছু গড়ে নিতে পারেন। আসলে শিল্প-সাহিত্য নামক ভোগ্যবস্তুর জন্য ভোক্তার একান্তই প্রয়োজন। এখানেই তো কারখানার শ্রমজীবীর সঙ্গে সাহিত্যিকের সাদৃশ্য সব চেয়ে বেশী। 'একাকী গায়কের নহে তো গান'। স্রষ্টা যখন আছেন, তখন ভোক্তার উপস্থিতিও অপরিহার্য।

॥ চ ॥

বস্তুবাদী সাহিত্যতত্ত্বের বিকাশ বাঙলায় ঘটেছিল বিশ শতকের শুরু থেকেই।

---

* বলা বাহুল্য ইউরিপাইদস্ লিখেছিলেন গ্রীক ভাষায় এবং সার্ত-এর অবলম্বন তাঁর মাতৃ-ভাষা-ফরাসী।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে রাশিয়ার মুক্তি-আন্দোলনের সাফল্যের বার্তা এসেছিল লোভে, সংঘর্ষ ও মুক্তির বস্তুভিত্তিক প্রকাশরূপে। এদেশে ভাববাদের নিশ্চিন্ত দুর্গে বস্তুবাদীদের আঘাতের প্রথম লক্ষ্য ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথকে নিতান্তই আশা-আনন্দ-ভাবুকতাবিলাসী বলে অভিযুক্ত করলেন। সাহিত্যের সবটুকুই 'আশমানদারি' নয়, 'জমিদারি'র অংশটাও অনুপেক্ষণীয়, একথা বলেও যেহেতু রবীন্দ্রনাথ নিরেট বস্তুর শাসনকে সাহিত্যের প্রাণ-সংহারক বলে বিবেচনা করতেন, তাই তাঁর রোমান্টিক কাব্যাদর্শও কুলিশ-কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিল তখন। রবীন্দ্রপক্ষ-সমর্থনে সক্ষম লেখনীর অসম্ভাব ছিল না। কিন্তু বিশ্বসভায় সদ্য-প্রতিষ্ঠিতের বিস্তারিত স্পষ্টোক্তি তখন অনেক জরুরী; যেহেতু, পরিবর্তমান বিশ্বে শিল্পী-সাহিত্যিকের স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে শিল্পের যুগোপযোগী মূল্য নিরূপণের সমস্যা তখন বিশ্বব্যাপী। উনিশ শতকের অঙ্কুরিত সমস্যা বিশ শতকে মহীরুহ। গোগোল-পুশকিন-তলস্তয়-বালজাক-জোলা-মোপাসাঁ-হাওয়েলস থেকে গর্কি-তে অগ্রগতি আনুভূমিক (Horizontal) নয়, মাঝে উল্লম্ব (Vertical) ব্যাপারও আছে। সমাজে এবং সাহিত্যে মাঝে মাঝেই বাঁকের মুখে 'উল্লম্ফন' ঘটে যায়। নতুবা কেন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশে আপোষপন্থী য়ুটোপীয় সমাজতন্ত্রী সন্ত সিমো-ফুরিয়ের-এর পর হেগেলের পাঠশালার পড়ুয়া কার্ল মার্কস দুনিয়াকে শুধু ব্যাখ্যা করে তুষ্ট না থেকে তার পরিবর্তনের কথা ভাবতে লাগলেন? সঙ্গে এঙ্গেলস? পার্জিটিভিস্টদের সঙ্গে আত্মিক যোগ রক্ষা করে বালজাক-জোলা- ফ্লোব্যার-মোপাসাঁ চেয়েছিলেন, শিল্পী হবেন ঈশ্বরের মতই সর্বগ, সর্বজ্ঞ এবং অ-দৃষ্ট। ঘৃণা নয়, প্রেম নয়, করুণা নয়, বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষতায় মানুষকে নিরীক্ষণ করবেন তিনি। হাওয়েলস-এর তুলনায় জোলা প্রমুখ মানুষ সম্পর্কে অনেক বেশী তথ্যনিষ্ঠ এবং যথাযথ। কিন্তু জীবনের চিত্রের পরিবর্তে ঘটনার মানচিত্র আঁকেন যখন সাহিত্যিক, তখন সাহিত্য এবং সাহিত্যিক-বাস্তবতা উভয়েরই সুনিশ্চিত নিপাত ঘটে—হাওয়েলস-এর-এই সতর্কবাণী উদ্দিষ্ট হয়েছিল যাঁদের দিকে তাঁরা অবশ্যই যথাযথতার পক্ষপাতী। সুতরাং সাহিত্যের উপাদান স্বরূপ বাস্তব-কে, চলমান জীবনকে, যাঁরা মানতেন তাঁদের মতান্তরও ঐতিহাসিক সত্য। অতঃপর এঙ্গেলস-এর বিশ্ববোধ গর্কি-র ভাবনালোকে যখন 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' নামে জন্ম নিল তখন নতুনতর মাত্রা যোগ হল 'রিয়ালিজম' নামক সাহিত্যিক আন্দোলনের সঙ্গে। গর্কি 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম' কথাটা ব্যবহার করার প্রেরণা পেয়েছিলেন কোথা থেকে তা নিজেই জানিয়েছেন তিনি। এঙ্গেলস বলেছিলেন, জীবন হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন গতি ও বিবর্তন। জীবনে চিরস্থির সত্য কিছু নেই। এঙ্গেলস-এর অভিমত সাহিত্যতত্ত্বে প্রয়োগ করে গর্কি পূর্বেকার বাস্তবতা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখলেন। গর্কি জানালেন—সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার লক্ষ্য হচ্ছে, প্রাচীন পৃথিবীর টিকে থাকার ও তার ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং সেই প্রভাবকে সমূল উৎপাটিত করা। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার লক্ষ্য, সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং বিপ্লবী-সম্ভাবনার উন্নতিসাধন। জীবন হচ্ছে সৃজনধর্মী কর্মযজ্ঞ, যার লক্ষ্য, হল, স্থায়িত্ব

এবং সুস্থতা রক্ষার জন্য প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য—ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে পৃথিবীতে সুখে বাস করার জন্য নিজেদের একই পরিবারভুক্ত মানুষ হিসেবে গণ্য করা।

ঘটনাচক্রে বাঙালী সাহিত্যিক ও পাঠকদের বিশ্বনাগরিকত্ব তাঁদের 'বস্তুবাদ' সম্পর্কে পূর্বোক্ত য়ুরোপীয় আন্দোলন সমূহের শরিক করেছিল। বস্তুবাদ-এর সঙ্গে হয়ত হাত মিলিয়ে এসেছিল 'প্রগতি' শব্দটি। শব্দ দুটির আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে মতান্তর না থাকলেও প্রয়োগগত পার্থক্য দু'দলের মধ্যে ছিল স্পষ্ট। এক পক্ষে কল্লোল-কালি-কলমের নব্যতন্ত্রীরা এবং অন্যদিকে মার্কসীয় ভাবাদর্শে দীক্ষিত নবীনেরা। যদিও প্রাকৃতিক নিয়মে সব কিছুই ক্রমাগ্রসর এবং সাহিত্যও; তথাপি 'প্রগতি', যার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Progress', সাহিত্যে রূঢ়ার্থে প্রযুক্ত। কিন্তু পূর্বোক্ত দুটি শাখার নবীনেরাই রবীন্দ্র-উত্তরাধিকারকে পাশ কাটিয়ে প্রগতিশীল হতে চেয়েছিলেন। 'কল্লোল' (১৩৩৪-এর শ্রাবণে) রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রতিতুলনা করলেন। সেখানে বলা হল, রবীন্দ্রনাথের 'চিত্ত হোমানলের মত উপর দিকে উড়িয়া সুন্দরের মাঝে সত্যকে খুঁজিয়াছে, মলিনতার ভিতর নামিয়া তাহারও ভিতর যে পরমসত্য লুকাইয়া আছে—তাহার সন্ধান লুব্ধ হয় নাই', অপরদিকে 'জীবনের এই পাপের দিকটার চিত্রণে শরৎচন্দ্রের অসাধারণ শক্তির পরিচয়ে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়'। যেন 'পাপের দিকটার চিত্রণ ই' যথার্থ প্রগতির লক্ষণ। এঁরা এমিল জোলা-র *The Experimental Novel*-এর সেই বিখ্যাত উক্তি (পারী: ১৮৮০) 'The metaphysical man is dead; our whole domain is transformed with the coming of the physiological man' ধ্রুব জ্ঞান করেছিলেন। দেহবন্ধ মানুষের রূপচিত্রণ 'প্রগতি'র লক্ষণ; যেহেতু রোমাণ্টিক রবীন্দ্রনাথের তা ছিল না। কিন্তু ভোগ-বিমুখ 'পিউরিটান' শরৎচন্দ্রেরও কি তা ছিল? শরৎচন্দ্র নব্যতন্ত্রীদের উৎসাহে অনুপ্রেরিত হয়ে রবীন্দ্র-বিরোধী তত্ত্ব প্রচারে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু সাহিত্যের মৌলিক সমস্যার সমাধান চিন্তায় কি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কোন মুখ্য পার্থক্য ছিল? 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধে (১৩৩৪-এর আশ্বিন) যে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, 'কবি তো থাকেন বারো মাসের মধ্যে তেরো মাস বিলাতে। কি জানেন তিনি, কে আছে তোমাদের খড়গহস্তা শুচিধর্মী অনুরূপা, আর কে আছে তোমাদের বংশীধারী অশুচিধর্মী শৈলজা-প্রেমেন্দ্র-নজরুল-কল্লোল-কালি-কলমের দল,'...ইত্যাদি; সেই শরৎচন্দ্রই কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে একসময় গুরু মেনেছিলেন। সাহিত্যের রাজত্বে অর্থনীতি-জীববিজ্ঞান-সমাজবিজ্ঞান ভিড় করুক এটা রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশিত ছিল না। শরৎচন্দ্র চেয়েছিলেন, আমাদের সাহিত্যিকেরা গর্কি প্রমুখের মত সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান, জীবন ও নীতি সম্পর্কে যাবতীয় convention-কে ভেঙে দিন। তিনি বলেছিলেন যদি লেখাটা উত্তীর্ণ হয় তাহলে নীতির (প্রচলিত অর্থে) প্রশ্ন অবান্তর। সাহিত্যের কাজ হবে 'ভাবে, কাজে, চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়া ...।' জীবনের 'পাপের দিকটা'র রূপ-চিত্রণে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে শরৎচন্দ্রের সামর্থ্যকে প্রশংসা করেছিলেন শরৎ-প্রেমিক কল্লো-

লীরা; যেহেতু বে-আব্রুতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথমাবধি বাঙ্ময়। কিন্তু শরৎচন্দ্র নিজেও কি বে-আব্রুতার পক্ষে ছিলেন? তাহ'লে 'সাহিত্য ও নীতি' প্রবন্ধে নিশ্চয়ই বলতেন না, 'Art জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে,—এবং অনেক নোঙরা জিনিসই ঘটে,—তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদন নয়। প্রকৃতি বা স্বভাবের হুবহু নকল করা Photography হতে পারে কিন্তু সে কি ছবি!' রুশ-সাহিত্যের গর্কি-প্রমুখের সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, সাহিত্যের মাধ্যমে মুক্তি এনে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ঘোষণা, প্রভৃতির ভিতর যে তত্ত্ব-বিশ্বাস রূপ পেয়েছে তা অবশ্যই রাবীন্দ্রিক নয়। অথচ, নবীনদের উদ্দেশে তাঁর কথাগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব-ভাবনার গভীর পার্থক্য ছিল না: ক. 'লেখার শক্তি তোমাদের আছে স্বীকার করি। কিন্তু অন্য জিনিস তোমরা ধরলে না। পরাধীন দেশে কতরকম অভাব আছে—নানান দিক আছে—এটা যেন তোমরা একেবারেই অস্বীকার করে চলেছ'। খ. 'আর রসবস্তু যে কি, বাস্তবিক কি হলে মানুষ আনন্দ বোধ করে মানুষ বড় হয়, তার হৃদয়ের প্রসার বাড়ে—এসব চিন্তা করা দরকার ভাবা দরকার'। কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির লেখকদের অনেকের রচনায় যে নবীনতা ও নতুন পথে চলার সামর্থ্য শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করলেও একই অনুভূতির পুনরাবৃত্তি অবশ্যই পছন্দ করেন নি ভোগবিমুখ পিউরিটান' শরৎচন্দ্র। সাহিত্যে জোলার 'Physiological man'-এর রাজত্ব রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেন নি, শরৎচন্দ্রও নয়। কিন্তু নিশ্চয়ই পছন্দ করতেন তরুণ-অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র।

একদা 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত এবং অতঃপর মোহিতলাল নব্যতন্ত্রীদের সমালোচনা করেছিলেন তীব্র ভাষায়। ঠাট্টা করে মোহিতলাল মজুমদার এদের বলেছিলেন 'ছোট প্রগতি-মহাশয়', বলেছিলেন, 'এ আর কিছুই নয়—সেই শিশ্নোদর সমস্যারই কথা; সেইজন্য আর সকল সাহিত্য বাতিল হইয়া গিয়াছে।' শরৎচন্দ্রের অভিযোগই যেন মোহিতলালের কণ্ঠে তীব্র ভাষা পেল। ভাওয়ালের গোবিন্দদাস রক্ত-মাংস সহ নারীকে ভালোবাসার কথা সোচ্চার ঘোষণা করেছিলেন; মোহিতলালের নিজেরও প্রেমের ব্যাপারে নিষ্কাম বৈদান্তিকতা ছিল না, তরুণ রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'-এ কাব্যবীণার বাজনা বেজেছিল দেহের যন্ত্রেই। কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে'র কাহিনীতে যে-যৌনতা, 'গাব আজ আনন্দের গান'-এ দেহ-কেন্দ্রিক উল্লাসের প্রকাশ—'শক্তির উৎসব নিত্য যে আনন্দে স্নায়ুতে স্নায়ুতে শিরায়/যে আনন্দ সম্ভোগ স্পৃহায়—আনন্দে বিন্দু বিন্দু রক্ত-পাতে গড়িছে সন্তান'গাব সেই আনন্দের গান' অথবা বুদ্ধদেব বসু-র 'বন্দীর বন্দনা'য় 'রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষ বর্ষ উপবাসী শৃঙ্গারের হিয়া/রমণী রমণ রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি' এবং অনাবৃত বাসনার নির্লজ্জ প্রকাশ 'সভামধ্যে, মোর দৃষ্টি-'পরে/নিতান্ত নিরাবরণা, দরিদ্র, সহজ/তোমাকে দাঁড়াতে হবে; রহিবে না আর/রহস্যের অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রজাল'[১৬] তা অবশ্যই আঘাত হেনেছিল পূরবী-মহুয়া-শেষের-কবিতার রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনাকে এবং আহত হয়েছিল মোহিতলালের নিষ্ঠুর ভ্রূকুটির

১৬. 'প্রেমিক': বন্দীর বন্দনা

দ্বারা ( 'সেই শিশ্নোদের সমস্যারই কথা')। কল্লোলীয়দের দেহ বাসনাময় জীবনা-সক্তিকে মোহিতলাল 'শিশ্নোদর' পরায়ণতা ছাড়া ভাবতে পারেন নি অন্য কিছু। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছিলেন 'বে-আব্রু'। এর বেশী তীব্র শব্দ তিনি ব্যবহার করেন নি, ব্যক্তিগত শুচিতাবোধের জন্যই হয়ত বা। জীবনের তথাকথিত পাপের দিকটা চিত্রণের দ্বারা যেমন সেকালে একদল 'প্রগতি'র অহংকার করতেন, তেমনি আর এক ধরনের প্রগতি-লক্ষণ ফুটে উঠেছিল নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম এবং রুশদেশী বিপ্লবী সাহিতের দ্বারা প্রভাবিত অন্য একদলের দ্বারা। বস্তুতঃ যা-কিছু রবীন্দ্রনাথে অপ্রাপণীয় তা-ই নতুন এবং 'প্রগতিশীল' বলে চিহ্নিত হয়েছিল সেকালে। মোহিত-লাল একদলকে যেমন 'শিশ্নোদর' পরায়ণ বলেছিলেন, তেমনি আর একদল সম্পর্কে বলেছিলেন, 'Progressive literature বাক্যটিও একটি tautology। কোন সাহিত্যই সাহিত্য পদবাচ্য নয়, যাহা পূর্ববর্তী সাহিত্যকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই।' ১৩৪৫-এ মোহিতলালের এই প্রবন্ধের এক বছর আগে ১৩৪৪-এ ধূর্জটিপ্রসাদের 'প্রগতি' প্রবন্ধের জন্ম। ধূর্জটিপ্রসাদ ও মোহিতলালের প্রবন্ধ দুটির অন্ততঃ সাত/আট বছর পরে বিষ্ণু দের 'বাংলা সাহিত্যে প্রগতি' ও 'প্রগতিবাদী কবি'র প্রকাশ। 'প্রগতি'র ভূমিকায় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছিলেন, 'প্রগতির একটা সাধারণ লক্ষণ চলিত-সংস্কার হইতে মুক্তি'। কিন্তু এই পরিচয়ে ব্যাপকতা এত বেশী যে তাতে মোহিতলালের অভিমতও অনায়াসে আশ্রয় পায়। ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-ও মার্কসীয় পন্থাতেই প্রতিটি সামাজিক ব্যবস্থা পূর্বতন ব্যবস্থার প্রতিতুলনায় 'প্রগতিশীল' এই সিদ্ধান্তকে সাধ্য-আশ্রয়বাক্যরূপে স্বীকার করে অতঃপর সাহিত্যের প্রগতিলক্ষণ বিচারে দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টি প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু যে অর্থে 'কল্লোলে'র লেখকেরা 'প্রগতিশীল', প্রগতির সেই অর্থ তো মার্কসবাদীর অভিপ্রেত নয়। ১৩৪৪-এ ধূর্জটিপ্রসাদ যে 'প্রগতি' প্রবন্ধটি লেখেন তার পূর্ববর্তী রচনা ঐ নামেই কোন এক সময় 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৪৪-এর রচনায় ধূর্জটিপ্রসাদ 'প্রগতি'র স্বরূপ যে-ভাবে বিচার করেছেন তা থেকে কয়েকটি সূত্রের অনুসন্ধান ব্যর্থ না-ও হতে পারে :

১. প্রগতিশীল লেখকের চাই প্রাকৃতিক তথ্যের অন্তরানুভূতি, 'সিমপ্যাথি' নয়, 'এমপ্যাথি'।

২. প্রগতিশীল সাহিত্যে ঘটনার স্থান নির্দিষ্ট নেই, কারণ কাল সম্বন্ধে পূর্বেকার ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে।

৩. একটি 'ক্রাইসিস' থেকে অন্য 'ক্রাইসিসে' যাবার মধ্যে এই নকশারই ছবি প্রগতিশীল সাহিত্যিককে আঁকতে হবে।

৪. 'সমাজ পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলেও যে-নতুনত্ব সাহিত্যে আনা যায়, তাকে প্রগতিশীল সাহিত্যের অভিনবত্ব বলে ভুল করতে আমি রাজি নই'।

শেষোক্ত সিদ্ধান্তে মার্কসীয় সমাজচেতনার প্রভাব ধূর্জটিপ্রসাদ গ্রহণ করেছেন। তা সত্ত্বেও পণ্ডিত সুশোভন সরকার ( 'রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি' প্রবন্ধে ) ১৩৪৮ এ বলেন, 'প্রগতি কথাটা অনির্দিষ্ট, তার সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন'। কিন্তু 'প্রগতি' কথাটা

ঘিরে এত যে আয়োজন বা বিতর্ক তার মূলে ছিল ১৯৩৭-এ বাঙলাদেশের বহুজায়গায় 'প্রগতি লেখকসংঘে'র শাখা স্থাপনের মত ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৩৮ (১৩৪৫)-এর ২৪-২৫ ডিসেম্বর ক'লকাতায় সারা ভারত প্রগতি লেখকসংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে তাঁর ইংরেজীতে লেখা ভাষণে বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছিলেন, 'কাব্য লিখে কিন্তু সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে পারব না', অথবা 'যদিও সমস্ত শিল্পকর্মই গভীর অর্থে প্রচারকার্য, সমস্ত প্রচারকার্যই কিন্তু শিল্পকর্ম বা আর্ট নয়'; অথচ যে সভায় প্রবন্ধটি পড়া হয়, সেই সভায় গৃহীত ইশতেহারটিতে বলা হয়েছিল, 'অমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতের নূতন সাহিত্য আমাদের জীবনের মৌলিক সমস্যা বুভুক্ষা ও দারিদ্র্য, সামাজিক পশ্চাদপদতা ও রাজনৈতিক অধীনতার সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করবে। যা আমাদের নিরুদ্যম, নিষ্ক্রিয় ও যুক্তিহীন করার চেষ্টা করবে তাকে আমরা প্রতিক্রিয়াশীল বলে বাতিল করে দেব।' সুতরাং সাহিত্য মুখ্যতঃ আনন্দদায়ক, এই সনাতন বিশ্বাসের মর্মে আঘাত হেনে সাহিত্যের সামাজিক দায়িত্ব পালনের আবশ্যিকতা প্রচারই ছিল প্রগতি লেখক সংঘের (PWA) লক্ষ্য।

১৯৩০-এ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ('কাব্যের মুক্তি') 'অতিমর্ত্য' আর্টের অন্তিম রিক্ততা' পরখ করে দেখেই লিখেছিলেন, 'কবির উদ্দেশ্য তার চারপাশের অবিচ্ছিন্ন জীবনের সঙ্গে প্রবহমান জীবনের সমীকরণ' এবং যেহেতু সাময়িক জীবনের কষ্টিপাথরেই শিল্পোৎকর্ষের অনন্য পরীক্ষা; অতএব 'প্রত্যাখ্যান কবিকে সাজে না'; তথাপি সামাজিক দায়িত্ব পালনে শিল্পীর বিশেষতঃ কবির ভূমিকা কতদূর পর্যন্ত বিস্তার্য তিনি তা বলেন নি। বিষ্ণু দে, শিল্পীর অপক্ষপাতে, এবং নৈর্ব্যক্তিকতায় বিশ্বাসী সেই কবি যিনি 'পাঁজির বর্ষফলের মতো মার্কসিসমের চটক ব্যবহারে' অত্যন্ত বিরক্ত এবং শিল্পী ও শিল্পবস্তু—বিষয় ও টেকনিকে—যখন টান পড়ে 'জ্যাবন্ধ ধনুকের টংকার'-এর মত তখন সেই 'চৈতন্য-জ্যাবন্ধ টান'কেই বলেন 'প্রগতিশীল সাহিত্যের চিরকালীন লক্ষণ'। তিনি বলেন, 'মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে ঐ চৈতন্য'। 'ভ্রান্ত মার্কসবাদীদের টেকনিক বিমুখতার অতিরেক' নিঃসংশয়ে দুটি কিন্তু শিল্প-সাহিত্য নামক মানবিক কর্মপ্রক্রিয়ায় পার্টিলাইন বা মার্কসীয় নিয়ম কানুন প্রযোজ্য নয়, এমন একটি সিদ্ধান্তে উপস্থিতির জন্য যখন বিষ্ণু দে, এরভে এবং গারোদি-র দোহাই দেন ('রাজায় রাজায়') তখন সংশয় জাগে 'প্রত্যক্ষের দিকে বৈজ্ঞানিক ঝোঁক, সেই ঐতিহাসিক দৃষ্টির প্রসার'কেই কি তিনি 'প্রগতি' বলেছিলেন! মনে হয় ভূপেন্দ্রনাথ এবং ধূর্জটিপ্রসাদ 'প্রগতি' শব্দে যা বুঝতেন তা লেনিন-এর 'free literature' সদৃশ অথবা প্রগতি (Progress) বলতে মাক্সিম গর্কি যা বুঝতেন তার সমতুল। মুক্তিসুখের উল্লাস এবং সমাজতান্ত্রিক দেশ গঠনে যা উপযোগী, তাই 'প্রগতি' সাহিত্যের উপাদান। লেনিনের Party organisation and party literature রচনার পরে পাই গর্কি-র দেওয়া প্রগতি সাহিত্যের সংজ্ঞা। কিন্তু 'প্রগতি' শব্দের একটি মাত্র ধারণা তখনকার লব্ধ প্রতিষ্ঠ বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। তাই তো ১৩৪৮ এ-ও সুশোভন সরকার 'প্রগতি' কথাটাকে অনির্দিষ্ট বলেন। ১৯৪২-এ মাও-এর বিখ্যাত

ইয়েনান ফোরামের বক্তৃতা। সে বক্তৃতা ইংরেজি থেকে বাঙলায় অনুবাদ করেন কবি-সমালোচক অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তী, 'পরিচয়' পত্রিকার জন্য। ১৩৪৮-'৪৯-এর এই বক্তৃতার সঙ্গে অনেকের মত তখনকার অসামান্য প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-ও কি পরিচিত হয়েছিলেন? ১৩৫৫-এর 'নতুন সাহিত্য'-এ তাঁর প্রবন্ধ 'প্রতিবিপ্লবী সাহিত্য' প্রকাশিত হল। স্পষ্টভাষায় বললেন তিনি, 'বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যই প্রগতিশীল হতে পারে—যদি তার দৃষ্টি সাম্যবাদের আদর্শে নিবন্ধ থাকে'। কিন্তু একটি কোন মতাদর্শে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখলে তা শিল্পীর স্খলন ঘটাতে সক্ষম। তাই সংশয় মোচনে মাও-এর কথাটাই যেন জানালেন যা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্তেরও অনুকূল :

> সাম্যবাদী শিক্ষায় মানুষকে দীক্ষিত করতে গিয়ে আদর্শগত বিবর্তনের বাণীকে ঘোষণা করতে গিয়ে 'historical concreteness of the artistic portrayal' সম্পর্কে যেন আমরা অবহিত থাকি।

কিন্তু ঐতিহাসিক প্রগতি-লক্ষণের রূঢ় সত্যতা, যা সরলতা নয় এবং মার্কসীয় মতে গ্রহণ-যোগ্য, তার প্রতিবিম্বন যদি ঘটাতে হয়, তা কি সম্ভব শুধুই 'প্রতিভা'র উপর নির্ভর করে?

*In Defence of Decadents*-এ কবি সমর সেন, যিনি তখন একজন মার্কসবাদী কবিরূপে খ্যাত, বলেছিলেন :

> **With huge and vital sections of our population illiterate and dim in the background.... We can at present only soliloquise, we can not address the real audience,**

কবিতা বা সাহিত্যকে পেঁছে দিতে হবে বৃহত্তর জনজীবনে, তা কি সম্ভব অশিক্ষার ব্যাধিতে রুগ্ন রেখে সেই সব মানুষকে যারা দান গ্রহণে আগ্রহী, অথচ অক্ষম! লেনিন সেক্ষেত্রে পাঠকের মানসিক ও শিক্ষাগত উর্ধ্বায়ন কামনা করেছিলেন, গ্রহণযোগ্যতার লোভে শিল্পের অবনয়নকে নয়। সমর সেন-কে সরোজ দত্ত Cynic বলে বিদ্রূপ করেছিলেন কিন্তু তিনি কি ভুল বলেছিলেন যে, গণ-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ না নিলে সাহিত্যিক তাঁর অভিপ্রায়ে ও কর্মে অভিন্ন হতে পারবেন না! গণ-আন্দোলনের শরিক হওয়ার জন্য সুকান্ত অনেক সময় সার্থক কবিতা লিখতে পারেন নি, অগ্রজ কবির এই খেদ আংশিক সত্যের উপর দাঁড়িয়ে মাত্র। আসলে ম্যাচুরিটি অর্জনের বয়সটাও তো তিনি পান নি। কী লাভ কীটস-এর সঙ্গে তাঁর প্রতিতুলনায়! যাঁর প্রতিভার সমুন্নতি অলঙ্ঘ্য সেই রবীন্দ্রনাথও কি কুড়ি/একুশে কীটস এর তুল্য ছিলেন? গণ-আন্দোলনের অংশীদার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রদের প্রতিবাদ মিছিলে পা মিলিয়ে তাঁর পাঠকদের হতাশ বা প্রতারণা করেছিলেন কি? পল এলুয়ারের মন্তব্যের গভীরার্থ অনুধাবনীয়—কবি-সাহিত্যিকের কাছ থেকে এই প্রত্যয়ই কাম্য যে সব মানুষই তাঁদের মত সৌন্দর্যের প্রতি

আবেগময় অনুভূতি পেতে পারে। বহু আগে তাঁর 'লোকহিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মূল কথাটা জানিয়েছিলেন :

> আপনার উচ্চতার অভিমানে লোকের জন্য লোকসাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে পদে পদে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা।

লেখকের অভিমান তাঁর আত্ম-বিস্মরণের বা সাঙ্কেতিক আত্মহত্যা ঘটানোর অক্ষমতা-প্রসূত দুর্দৈব। মূল কথা তো প্রেম, মানুষের প্রতি প্রেম। প্রচলিত অর্থে গণসাহিত্যে যতই অরুচি থাক জীবনানন্দ বা বুদ্ধদেবের, এবং তাঁদের সমর্থন মিলুক এলিঅটে বা পাউণ্ডে, তথাপি মানিকই পরম সত্য কথাটি বলেছিলেন, 'জগৎ আর মানুষকে জানা বা ভালোবাসা যে একত্রীকৃত প্রক্রিয়া'। সেই 'ভালোবাসা' যদি সাহিত্যিকের বীজমন্ত্র না হত তাহলে বিশ শতকের মধ্যাহ্নে 'boredom' এবং Horror'-এর পরিবর্তে সব চেয়ে দুঃসাহসী মন্ত্রের জন্য বুদ্ধদেব বসুকে প্রতীক্ষা করতে হত না,—'বাঁচো, ভালোবাসো, হও'। তাঁকে শ্লোগান তুলতে হত না, 'চাই আনন্দের সাহিত্য'। এই বাসনা ঘোষণার দু'দশক পরে 'প্রয়োজনের শিল্প' এবং 'শিল্পের জন শিল্প' দুই বিরুদ্ধবাদীদের কাছ থেকে সম-দূরত্ব বজায় রেখে বুদ্ধদেব বললেন 'স্পটত মানুষের জন্যই শিল্প'। কিন্তু তাঁর কথাটা এতই অস্পষ্ট যে, তাঁর সিদ্ধান্ত বিষয়ে পাঠকচিত্ত যেন এক মুহূর্তে প্রতর্ক থেকে প্রমিতির স্বস্তিতে পেঁছে যায়। পাঠকের মনে হয়, এতো মার্কস-এরই কথার আর এক পিঠ 'Nothing human is alien to me'; কিন্তু না ; তারপরই বুদ্ধদেব বললেন অতন্ত সহজ সুরে, কেননা 'মানুষ ছাড়া কে-ই আছে তার স্রষ্টা ভোক্তা'। ১৯৩০-এর সুধীন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে বুদ্ধদেবের মিলবে না যে, 'শিল্পোৎকর্ষের অনন্য পরীক্ষা সাময়িক জীবনের কষ্টি-পাথরে তার যোগ্যতা কষে দেখা' ; কারণ, বুদ্ধদেবের মতে, সাময়িকতার দিকে নয়, কবির মুখ 'চিরন্তনের দিগন্তরেখার দিকে' প্রসারিত। বুদ্ধদেব যখন বলেন, 'যে শিল্প কোনো সাংসারিক সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের বেশি আর কিছুই করে না, তা সাংবাদিকতার মতোই অচিরস্থায়ী' ; তখন কেউ কি আপত্তি করবেন ? এমন কি কট্টর মার্কসপন্থীও ? অবশ্যই নয়। অভিজ্ঞতা কি বলে না, যে-সাহিত্যে মানুষ বাঁচার পথ দেখে, সেই সাহিত্যকেই মানুষ বাঁচিয়ে রাখে নিজের গরজে ? তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি ছিলেন কথা-সাহিত্যের জগতে 'চতুর্থ সম্রাট', যিনি একবার বাঙলাদেশের 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘের' প্রকাশ্য সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন, তিনি সাহিত্যিকদের দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছিলেন—'বৈষ্ণব' ও 'শাক্ত'। 'বৈষ্ণব' বলতে তিনি তাঁদেরই বুঝিয়েছিলেন যাঁরা সুন্দর-শোভন ললিত ও সুকুমারে আগ্রহী, আর 'শাক্ত' তাঁরাই যাঁদের আকর্ষণ রক্তমাংস-মজ্জা-ক্লেদ-গ্লানির রূপ রচনার দিকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ( 'সাহিত্যের সত্য' ) আশা পোষণ করেছিলেন :

> সাহিত্যিকের মধ্যে আমরা শুভবুদ্ধির আশা করব ; অন্তত যখন তাঁরা সমাজের পক্ষে, ব্যক্তির পক্ষে বিপজ্জনক উপাদান নিয়ে সৃষ্টি করেন, তখন।

সাহিত্যিক সমাজসেবীর ভূমিকা নিয়ে কোন সামাজিক ক্রিয়া করেন না এবং শুধুই সমাজের হিতসাধনও তাঁর লক্ষ্য নয়। সুতরাং তিনি বৈষ্ণব বা শাক্ত যে-পন্থীই হোন যেহেতু তিনি 'আর্টিস্ট' এবং সব আর্টিস্টের মতই মিতব্যয়ী, হৃদয়ের প্রেরণায় প্রয়োজনীয় ছাড়া অন্য সব উপকরণই বাতিল করেন এবং সাহিত্যের 'অস্থি' ও 'মর্মে' লিপ্ত করে দেন 'কালচেতনা' ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ; সুতরাং যাকে বহির্জাত কারণ বলে মনে হয় সেই 'রিয়ালিটি'-কে বিসর্জন দিলে তিনি হয়ে পড়েন আত্মঘাতী। সাংসারিক ও সামাজিক প্রয়োজন মিটিয়েই সাংবাদিকের চৌহদ্দি পার হতে হবে সাহিত্যিককে। বদল্যার-এর অ্যালবাট্রস হওয়া একালের কবিকে মানায় না। তাই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন :

> নিরপেক্ষ শিল্প, তথা নিরাসক্ত সাহিত্য, আপাতত সোনার পাথরবাটি অথবা আকাশ কুসুমের মতো নিরুপাখ্য সামগ্রী।

এবং

> সম্প্রতি আর আমার তিলার্ধ সন্দেহ নেই যে রূপকার সমাজভুক্ত জীব, তার ব্যবসায় সমাজসেবার অঙ্গীভূত, যে-শক্তি সামাজিক পরিস্থিতির নিয়ন্তা তাই সাহিত্যের প্রাণবস্তু, এবং নিরালম্ব কল্পনা নির্গুণ ব্রহ্মের চেয়েও নিরর্থক।

প্রশ্নটা যদি হয় সাহিত্যিকের শিল্পীসত্তার সমাজভুক্তি নিয়ে, তাহ'লে কবি এবং ঔপন্যাসিকেরা হয়ত নিজস্ব শিল্পরূপের চাহিদায় ভিন্ন মতাবলম্বী হয়ে পড়েন; কিন্তু সেই পার্থক্যের মূল মাত্রাগত। যে গাছের ফুল আকাশের দিকে তার মূল তো মাটিতে, যদি তা 'প্যারাসাইট' না হয়। সুতরাং এলিঅট-পাউণ্ড এবং তাঁদের পন্থানুসারী কিছু মানুষ ছাড়া কবিদের সম্পর্কে জীবনানন্দের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হবেন অনেকেই :

> তাঁর নিজের প্রতিভার কাছে তাকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে শুধু কতিপয়ের হাতে তাঁর কবিতার দান অর্পণ করে।

সাহিত্যকে 'কতিপয়ের হাতে·· অর্পণ করে' সাহিত্যিক সার্থক হবেন, একথা সেই বুদ্ধদেবও বলেন নি যিনি আনন্দের সাহিত্যের পক্ষে শ্লোগান দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ কবি ও ঔপন্যাসিকের জগৎ পৃথক বলে তাঁদের 'কমিটমেন্ট'-এর প্রকাশও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। উপন্যাস বা নাটকে ভূমির আকর্ষণ তীব্রতর। কিন্তু কবির কবিতাও বায়ুভূত নিরালম্ব নিরাশ্রয় হতে পারে না। যত বড় মহীরুহের সম্ভাবনাই থাক বীজের আশ্রয় ভূমিগর্ভ। 'প্রগতি' বা 'প্রতিক্রিয়া'র প্রশ্নই অর্থহীন যদি অতি মিতব্যয়ী 'আর্টিস্ট' ভুলে বসেন তাঁর মূলটা কোথায়? প্লেখানভ-কডওয়েল কলাকৈবল্যের প্রতি আক্রমণ শানিয়েছিলেন কলাবিলাসীদের কল্পনার মণিহর্ম্যে আত্মগোপন করার জন্য। এঁদের অভিপ্রায়ে শিল্পের বিনিময়ে অর্থোপার্জনের হীনতাও চোখে পড়েছিল তাঁদের।

আসলে যত মনোরমই হোক আয়নার ভিতরকার প্রতিবিম্ব, মুগ্ধা লেডি অব শ্যালটের অপ্রতিরোধ্য নিয়তিই হল ব্যর্থতা ও বেদনা। এ যেন বদ্‌ল্যার-এর ভগ্নপক্ষ অ্যালবাট্রসের করুণ পরিণতির রূপান্তর। রবীন্দ্রনাথ যদ্যপি রসবস্তুকেই একমাত্র বাস্তব এবং নিত্যবস্তু বলে ঘোষণা করে Appearance-এর সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক-বিচারটা পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলেন তথাপি উত্তরকালে ঐ প্রসঙ্গটাই ফিরে এসেছে বারে বারে।

অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'কল্পনা ছাড়া বাস্তব, বাস্তব ছাড়া কল্পনা কোনো আর্টিস্টের কাজে দেখা যায় না।' প্রমথ চৌধুরীও দুই-এর সমন্বয়ে বিশ্বাসী। মোহিতলাল তো 'Realism' এবং 'Idealism' শব্দগুলোই অসার্থক মনে করতেন। আর যে-শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্র-বিরোধীদের একটি গোষ্ঠী তাঁদের মুখপাত্ররূপে দেখেছিলেন তাঁরও সিদ্ধান্ত ছিল, 'একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা হয় না, অন্তত উপন্যাস যাকে বলে সে হয় না'। একথা শুনলে কিন্তু গর্কির কথাই মনে পড়ে সর্বাগ্রে যাঁর উক্তির ইংরেজি রূপান্তর হল 'in great artists realism and romanticism seem to have been blended.' বস্তুতঃ দর্শন থেকে সংগৃহীত ঐ শব্দ দুটি শ্রুতিতে যে পার্থক্যবই ইঙ্গিত করুক, পারিভাষিক নৈষ্ঠিকতা নিতান্ত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিসূচক, সংঘর্ষ যার সুনিশ্চিত পরিণাম। সেই সংঘর্ষে নিপুণ যোদ্ধা রবীন্দ্রনাথও বেসামাল হয়ে পড়েন, 'লালটুপি পরা রাশিয়ান হেডপণ্ডিত' জাতীয় মন্তব্যে। অনুজ কবি জীবনানন্দও সংশয়ী ছিলেন মার্কসীয়আদর্শে লেখারুশ সাহিত্যিকদের সাফল্যে। এঁরা সুসাহিত্য রচনা করতে সক্ষম হলেও নাকি মহৎ সাহিত্য রচনায় ব্যর্থ, যেহেতু মহান সাহিত্য জন্ম নেয় না কোন কিছুর তাগিদে, গোষ্ঠীর সম্মিলিত সিদ্ধান্তে। অথচ শরৎচন্দ্র বাঙালী সাহিত্যিকদের সাফল্য সন্ধান করেন গর্কি প্রমুখের আনুরূপ্যে। আর মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের এবং কডওয়েল-এর মন্তব্য আশ্রয় পায় মানিকের অন্তরঙ্গ ডায়েরির পৃষ্ঠায়। বায়োলোজির লেকচারার, সোসিওলজির গোল্ডমেডালিস্ট এবং ইকনমিক্সের অধ্যাপকের সাহিত্যরাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশে (?) আতঙ্কিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনানন্দ প্রায় একই সিদ্ধান্তে এলেন অন্য ভাষায়—বিজ্ঞান-দর্শন-সমাজনীতি হৃদয়ের মধ্যেই সত্য হয়ে আছে এবং অন্য জিনিস হয়ে।...বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন মানিক। ফ্রয়েড এবং অতঃপর মার্কস আকৃষ্ট করেছিলেন তাঁকে। সর্বদাই বিজ্ঞানের পক্ষে তিনি :

> নিত্য নতুন আবিষ্কারে বিজ্ঞান বদলে দিয়ে চলে সমাজ ও জীবনকে, বদলে দিয়ে চলে মানুষের চেতনাকে। এই চেতনায় জাগে সাহিত্যের কাছে নতুন চাহিদা এবং এই চেতনা প্রতিফলিত হয় আঙ্গিকে উপন্যাস রচনায়।

রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দের সঙ্গে শরৎচন্দ্র-মানিকের কেন এই প্রত্যয়গত পার্থক্য? কারণটা কি অনুসন্ধেয় কবি-ঔপন্যাসিকের রূপসৃষ্টিগত পার্থক্যে? না কি পৃথক দুটি বিশ্বাসের জগৎ থেকে উচ্চারিত হয়েছে দুটি বিপরীত অভিপ্রায়? হয়ত আবার দুটি কারণই সমান সক্রিয়। তবে ঐতিহাসিক ঘটনা হল, য়ুরোপীয়রা বুঝেছিলেন

বিশুদ্ধ ন্যাচারালিস্টিক সাহিত্য প্রায় অপাঠ্য এবং রবীন্দ্র-ভাবনার বিরোধিতা করেও শরৎচন্দ্র তাঁর স্নেহধন্য অনুজ কল্লোলীয়দের দিকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন, 'নোঙরামি যে সাহিত্যের অন্তর্গত নয় একথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। বিজ্ঞান হইলেও নয়, অবিজ্ঞান হইলেও নয়।' মনে হয়, এদেশে ওদেশে গোল বেঁধেছিল বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে অভিন্ন ভাবার ভ্রান্ত প্রবণতা থেকে। যেহেতু সৃষ্টিও নির্মাণের মুখাপেক্ষী, সুতরাং বিজ্ঞান-বুদ্ধির শাসন রূপ-পরিপাট্যে অবশ্যগ্রাহ্য। বস্তুতঃ মানুষের প্রতিটি 'কর্ম' এক অর্থে পারস্পরিক সম্পর্ক-সূত্রে বদ্ধ, অথচ প্রবলরূপে স্বাধিকার-সচেতন। সাহিত্য যে-মানুষ সৃষ্টি করে, সেই জগৎ বিধাতা মানুষই Ethics-রচয়িতা। কিন্তু 'চিত্রাঙ্গদা'র রবীন্দ্রনাথ, 'চরিত্রহীনে'র শরৎচন্দ্র, 'লেডি চ্যাটার্লি'র লরেন্স-এর উপর কি নেমে আসেনি নীতিজ্ঞানীর খড়গাঘাত? ষাটের দশকের অন্তিমে সমরেশ বসুও কি আমাদের একালীনদের নীতিবোধে নাড়া দেন নি? অথবা, 'রাত ভোর বৃষ্টি'র বুদ্ধদেব বসু? আক্রান্ত বুদ্ধদেব লিখলেন 'কবিতার শত্রু ও মিত্র' নামে এক শিল্পগুণান্বিত খোলা চিঠি এবং 'চরম চিকিৎসা' নামে প্লেটোনিক পদ্ধতির বিতর্ক্য রচনা। এরও প্রায় দু'দশক আগে তিনিই লিখেছিলেন 'শিল্পীর স্বাধীনতা'।

১৯৩৮-এ যে-বুদ্ধদেব তাঁর ইংরেজিভাষণে শিল্পীকে সামাজিক দায়বদ্ধতার নিগড় থেকে মুক্তি দিতে সুপারিশ করেছিলেন, সেই তিনিই ১৯৫২-তে সমকালীন কবি-বন্ধু জীবনানন্দের মত জানালেন, 'আমি বলতে চাই যে শিল্পী স্বভাবতই ব্রাত্য; কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ে ভর্তি হওয়া কোনো সংঘবদ্ধ মতবাদ গ্রহণ করে সেই মতেই নৈষ্ঠিকতা বাঁচিয়ে—এটা তাঁর প্রকৃতির পক্ষে অনুকূল নয়;...শিল্পীর মন বহুরূপী।' গোষ্ঠী ও রাজনীতিগত বিশ্বাস থেকে শিল্প ও শিল্পীকে বুদ্ধদেব বরাবরই রক্ষা করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রিয় কবি বদল্যার-এর মত তিনিও হয়ত কবির উপমান খুঁজতেন মুক্তপক্ষ সমুদ্র-বিহঙ্গ অ্যালবাট্রসের মধ্যে। কেন বিষ্ণু দে? যে- বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় লোভী ধনী-কে বোঝাতে 'নহুষ'কে স্মরণ করেন, কংস-এর নাম ব্যবহার করেন ফ্যাসিবাদ বোঝাতে, 'বিভীষণ' ও 'যুযুৎসু'র প্রতীকে স্বশ্রেণীত্যাগী সাম্যপন্থী মধ্যবিত্তকে বোঝান; 'চোরা-বালি' কাব্যের 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায় বিপ্লবরূপী রাজপুত্রের আবির্ভাব লক্ষ্য করে বলেন:

> কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরোথরো
> কামনার টানে সংহত গ্লেসিআর
> হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো
> হে দূর দেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার।

সেই বিষ্ণু দে ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরো-র সদস্য রোজার গারোদি-র সমর্থন খুঁজে পেয়ে বলেন 'সাহিত্যে পার্টিলাইন বা মার্কসীয় নিয়মকানুন প্রযোজ্য নয়'। বিশুদ্ধ সাহিত্যের পক্ষপাতী বুদ্ধদেব এবং প্রগতিবাদী মানিক এই দু'পক্ষ সম্পর্কে বিষ্ণু দে

বিপদের রক্তিম আলোর সংকেত দেন নিজের বাতিঘরে বসে, পাশে তাঁর গারোদি বা এরেভে ; লেনিনের 'Party organisation and party literature' নয়। বিষ্ণু দে মার্কসবাদে প্রত্যয়ী হয়েও সাহিত্যে পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তার মধ্যে অনেকেই নিন্দনীয় Contradiction খুঁজে পেয়েছেন।

'পার্টিলাইন' সাহিত্যিক কতটা মেনে চলবেন, কতটুকুই বা তাঁর স্বাধীনতা, এ সবই বিতর্কের বিষয়। নইলে যে সার্ত (Sartre) একসময় যুদ্ধবন্দীর জীবন কাটিয়েছেন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং বিশ্বশান্তি কাউন্সিলের সদস্যের মর্যাদার আসন লাভ করেছেন, সেই তিনি ১৯৪৮-এ *Dirty hands* লিখে ঝড় তুলে দিয়েছিলেন। রাশিয়ার ফাদায়েভ তাঁকে আগেই বর্জন করেছিলেন, স্বদেশের রোজার গারোদিও তাঁকে 'সাহিত্যিক অপরাধী' বলে ধিক্কার দিয়েছিলেন। গারোদি ঠাট্টা করে লেছিলেন 'Sartrian variant of Marxism' বলে কিছু নেই। একসময় পার্টি সদস্য হওয়ার প্রস্তাব পেয়েও সার্ত তা প্রত্যাখ্যান করেন, যেহেতু 'পার্টিলাইন' শিল্পীর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করতে পারে। অথচ ১৯৬৪'র মে মাসে একটি লেখায় সার্ত এমন বক্তব্য উপস্থাপিত করেন যা লেনিনও হয়ত সমর্থন করতেন—'সাহিত্য হবে সর্বজনীন। সুতরাং সাহিত্যিক যদি নিজেকে সকলের কাছে তুলে ধরতে চান এবং সকল পাঠকের আনুকূল্য কামনা করেন তাহ'লে তাঁকে জনগণের বৃহত্তম অংশ—লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্তের কাছে নিজেকে বিস্তৃত করে দিতে হবে'। সার্ত এই দায়িত্ব বোধের ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট কথায় জানালেন এই বলে যে, শিল্পীর কাজ রসিকের কাছে message পৌঁছিয়ে দেওয়া। পৌঁছে দেওয়ার পদ্ধতিটা যদি শৈল্পিক হয় তাহ'লে 'পার্টিলাইন'-এ কেন আপত্তি? শুধু পার্টিলাইন-এ নিষ্ঠাবান বলেই কারুকে শিল্পী বলতে হবে, এমন কথায় বিরোধিতা করেছিলেন তাঁর ইয়েনান ফোরামের বিখ্যাত বক্তৃতায় মাও ৎ সে তুং। ইলিয়া এরেনবুর্গও জানিয়েছিলেন অনুরূপ অভিমত—লেখক সংঘের সভ্য-কার্ড পকেটে থাকাটাই যথেষ্ট নয়। এর জন্যে আপনার উদ্দীপিত হৃদয় থাকা চাই। ...মূল কথা লেখক হওয়া চাই।... বিষ্ণু দে'র মত নামী কবি পার্টিলাইন-এর প্রতি অনুরাগে ভীত ছিলেন, পার্টি-সদস্যপদ শিল্পীর সর্বনাশ করে এই ভয় ছিল সার্ত-এর ও। কিন্তু শুধু পার্টি কেন, পূর্ব সৃষ্ট কোন সনাতন 'লাইন'এ অতি আসক্তিই তো কবির সর্বনাশ করতে পারে। কবিতার বা সাহিত্যের যে কোন রূপের চর্চা করতে করতেই কি একজন তাঁর Commitment-এর তাগিদে বিশেষ পন্থী বলে বিবেচিত হতে পারেন না? যদি লক্ষ্যবস্তু হন পাঠক, যদি কবিতার উদ্দেশ্য হয় পাঠকের কাছে যাওয়া এবং তাঁকে ফিরিয়ে আনা, যদি পাবলো নেরুদা-র মত কেউ বলতে পারেন—বহু মানুষের জন্য আশার প্রতীক হওয়া, যদি তা এক মুহূর্তের জন্যও হয়, তা হবে একজন কবির পক্ষে অবিস্মরণীয় এক গভীর মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা—তাহ'লে 'পার্টিলাইন'-এর দুর্ভাবনা কেন বিচলিত করবে কবিকে? বিষ্ণু দে-র মত কবি যাতে অস্বস্তি বোধ করেছিলেন সেই অস্বস্তি তাঁর সমকালীন মানিকের ছিল না, দীনেশ দাশ, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর বা আরও অনেকেরই ছিল না। 'কলকাতার

যীশুর কবি অন্তত: বামপন্থী পার্টিলাইন-এ আসক্ত বা প্রত্যয়ী ন'ন। তবু তাঁর ঐ কবিতার মর্মগ্রহণে অনাগ্রাহী আছেন কি কোন বামমার্গী? 'পার্টি ডিসিপ্লিন' ব্যাপারটা 'ডিসিপ্লিন'ই, লৌহ-শৃংখল নয়। কোন্ কবির তা আছে তা না জেনেও কবিতা পড়া যায়, প্রাণিত হওয়া যায়। তরুণ কবি জয় গোস্বামী (জন্ম ১৯৫৪) কোন্ 'পার্টি ডিসিপ্লিনে'র মানুষ তা জানা নেই এই লেখকের। কিন্তু ভিতর থেকে বাধা আসেনি, —এমন কি পোলিটিকাল কমিটমেন্ট সত্ত্বেও—উক্ত কবির 'রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে' কবিতার আস্বাদনে :

> এসেছি যখন খালি হাতে ফিরবো না
> হাতের সামনে যা পাচ্ছি নেবো তাই
> একাই নেবো না, ভাইকেও দেবো, ভাই দেবে তার বোনকে
> দিয়েছি যখন, ফিরিয়ে নেবো না মনকে
> ... ... ... ... ... ...

পাশাপাশি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মে দিনের কবিতা', চেরবান্দা রাজুর যে-কোন কবিতা 'কমিটেড' হলেও প্রাণিত করে, উদ্দীপিত করে এবং কবিতা বলেই করে, পার্টির কথা বলে নয়। শঙ্খ ঘোষ, কবির উদ্দীপিত করার সামর্থ্যকে চিহ্নিত করেছেন 'প্রবাহিত মনুষ্যত্বে'র প্রতি 'অটুট ভালোবাসা'র প্রকাশ বলে। এই ভালোবাসার সত্যতা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় বাঙময় হয় 'শ্লোগান' হিসেবে নয়, কবিতা হিসেবে :

> অন্ন বাক্য অন্ন প্রাণ অন্নই চেতনা
> অন্ন ধ্বনি অন্ন মন্ত্র অন্ন আরাধনা।
> অন্ন চিন্তা অন্ন গান অন্নই কবিতা,
> অন্ন অগ্নি বায়ু জল নক্ষত্র সবিতা।
> অন্ন আলো অন্ন জ্যোতি সর্বধর্মসার
> অন্ন আদি অন্ন অন্ত অন্নই ওংকার
> সে অন্নে যে বিষ দেয়, কিংবা তাকে কাড়ে
> ধ্বংস করো ধ্বংস করো ধ্বংস করো তারে।[১৭]

একজন সাহিত্যিকের কমিটমেন্ট মূলত মানুষের কাছে, 'প্রবাহিত মনুষ্যত্বে'র কাছে—সব সাহিত্যের জন্ম-উৎসের কাছে। সুতরাং আশংকার কারণ 'পার্টিলাইন' নয়, অন্য কিছু—লেখকের সাহিত্য রচনায় অপটুত্ব। 'পার্টিলাইন'-এ অনুরাগ সম্পর্কে বিষ্ণু দে'র অভিমত অনেক বিশিষ্ট প্রতিভাবানেরই অভিমত। কিন্তু 'অফুরন্ত রোদ'-এর তরুণ কবি করুণা[১৮] জয় গোস্বামীদের হয়ে স্পষ্ট জানিয়েছেন :

১৭. শঙ্খ ঘোষের 'কবিতার মুহূর্ত' পৃ. ১১৬-১১৭ থেকে পুনরুদ্ধৃত।
১৮. করুণাসিন্ধু দাস। বৃত্তিতে অধ্যাপক। ওঁর কবিতায় প্রচুর সম্ভাবনা। স্বভাবে শঙ্খ ঘোষের মতই নম্র। বর্তমান লেখকের কাছে ২৩.৯.৮৭ তাং-এর চিঠি।

তবু বলব, পশ্চাদ্‌মুখীন ক্ষীয়মাণ সমাজশক্তির বশংবদ হয়ে তথাকথিত শৈল্পিক নিরপেক্ষতার ছুতোয় আত্মরতি সর্বস্ব, সমাজবিমুখ বাগাড়ম্বরপূর্ণ অপসাহিত্য করার মূঢ়তার চেয়ে উচ্চকণ্ঠে মানুষের পক্ষে কিছু কথা পদ্যবন্ধে সাজানোও ঢের বেশী মহৎ কাজ।

কবিতা যদি অলংকারশাস্ত্রানুমোদিত না হয় তাতেও এঁদের আপত্তি নেই। এঁদের আপত্তি 'আত্মরতিসর্বস্ব' 'সমাজবিমুখ' অপসাহিত্যের বিরুদ্ধে। বস্তুতঃ নবীনেরা কলা-কৈবল্যের অছিলায় অপসংস্কৃতি প্রচারের বিরুদ্ধে একালে মুখর। তথাপি বক্তব্যের 'শিল্পসম্মত সজ্জা' সম্পর্কে মাও-এর বক্তব্য তাঁদের নিশানা ঠিক রাখে। কবিতায় বক্তব্য থাকবে, কিন্তু তা যেন প্রসাধন পারিপাট্যে হারিয়ে না বসে আপনার অকৃত্রিম রূপ ও সৌন্দর্য। আসলে 'বিষয়টাই কবিতা নয়'— এই রাবীন্দ্রিক সিদ্ধান্তে এঁদের আপত্তি নেই কিন্তু রূপকৈবল্যে এঁদের প্রচণ্ড বিরাগ। একালে যাঁকে আর বয়সে নবীন বলা যায় না, কিন্তু মনের তারুণ্য ছাড়াও যিনি তরুণদের হয়ে বলেন বলেই তাদের প্রতিনিধিত্ব বজায় আছে, নাম তাঁর শঙ্খ ঘোষ। কবি হিসেবে একদা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন শিশির দাশ। শঙ্খ ঘোষ ও শিশির দাশ উভয়েই বিগত একদশকের উপর কাব্যসাহিত্যের ভাব, তাষা নিয়ে লিখেছেন উল্লেখ্য কিছু বই। কিন্তু সে সবের পাশে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'কবিতার ক্লাস' এবং 'কবিতার কী ও কেন?' বড়ই করুণ। সুধীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ-বিষ্ণুদে-বুদ্ধদেবের পর এ যেন মহাপতন। কবি তাঁর উপলব্ধিকে প্রকাশ করবেন তাঁর মাটিতে দাঁড়িয়ে। কী প্রয়োজন প্রবীণ প্রাজ্ঞজনের পঙক্তি উদ্ধার করে করে ছাত্র-পাঠ্য একখানি স্বল্পায়তন গ্রন্থ রচনা করার? গবেষকের কোন দায় নেই সেই কবির কমিটমেন্ট নিয়ে, যিনি নিজেই জানেন না তাঁর 'কমিটমেন্ট' কার কাছে? তথাপি নীরেন্দ্র-নাথের 'কবিতার কী ও কেন?' আলোচনা করা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথই যে সকলের প্রত্যয়-ভূমির কেন্দ্রে তা প্রমাণের জন্য।

প্রাগুক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'কবিতা কী'। রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ, টমাস গ্রে থেকে কোলরিজ অনেককেই স্মরণ করে গ্রন্থকার জানালেন, 'এখন আমরা বলতে পারি যে, কবিতা আসলে শব্দকে ব্যবহার করবার এক রকমের গুণপনা'। কবিতা বিশেষ এক ধরনের 'গুণপনা'—এমন কথা অসমাপ্ত বাক্য মনে হয় না কি? বলতেন যদি 'এক রকমের গুণপনার 'প্রকাশ' তাহলে ঠিক হত। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'প্রকাশই কবিত্ব' যদিও বলা উচিত ছিল প্রকাশিত রূপই কবিতা। নান্দনিক তত্ত্বোচ্চারণে 'প্রকাশ' শব্দের ওজন ও গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। 'কবিতা কেন' আলোচনাটি নীরেন্দ্রনাথ প্লেটো-অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করেছেন ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থরচনার নিষ্ঠায়। এক সময় যখন তিনি বলেন 'সব চেয়ে বড় প্রাপ্তি সৌন্দর্যদর্শন' তখন নতুন কিছু শুনি না; শেষ পর্যন্ত তাঁকে রবীন্দ্রনাথে প্রত্যাবৃত হতে দেখে স্বস্তি বোধ করি—'কবিচিত্তে যে অনুভূতি গভীর, ভাষায় রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।' নীরেন্দ্রনাথের বারংবার রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ উত্তরকালের কাছে রবীন্দ্রনাথেরভাবনার গুরুত্ব প্রমাণিত করে। 'কবিতা কোথায়'

নিঃসন্দেহে একটি গুরুতর প্রশ্ন। কারণ, কবিতা কোথায় নেই ? কবির যে-দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কবিতার নাম কবিতা তার পরিমাপে স্থান-কাল-বিষয়ের প্রসঙ্গ অসংখ্য। কবিতা তথা সাহিত্যের বিষয়বস্তুর ক্রমবিস্তৃত পরিধি আমাদের এই সিদ্ধান্তই প্রমাণ করে। নীরেন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের আগে দেশী-বিদেশী কবি ও সমালোচকদের কাছ থেকে সাহায্য নেন। তারপর শেষ মুহূর্তে আপন কথায় আসেন যা অবশ্যই অভিনন্দন যোগ্য :

> যদি বলি, কবিতার অগ্রগতির প্রতি আমাদের নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহের যে ইতিহাস এক হিসেবে তা কবিতার ভাষা, ভাবনা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমাদের ভিতরকার বাধাগুলিকেই বারবার পেরিয়ে আসবার ইতিহাস, তাহলে নিশ্চয় বাড়িয়ে বলা হবে না।

কবিতার প্রকাশগত দুর্বোধ্যতার বিরুদ্ধে নিত্যকালের অভিযোগ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। অথচ সেই অভিযোগের নিরেট প্রাকার পার হয়ে রসিক সুজন কবিতাকে বরণ করে নিয়েছেন অসীম আগ্রহে। নীরেন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন, এ হল 'আমাদের ভিতরকার বাধাগুলিকেই বারবার পেরিয়ে আসবার ইতিহাস'। এই সূত্রেই তাঁর 'কঠিন কবিতা' রচনাটি আগ্রহ জাগায়। ব্যক্তিগত ভাবে নীরেন্দ্রনাথ সহজ কবিতার কবি, অন্ততঃ দুর্বোধ্যতার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয় নি। নীরেন্দ্রনাথ মনে করেন, সাধারণ মানুষের তুলনায় যাঁর দৃষ্টি দূরে সম্প্রসারিত যিনি ক্রান্তদর্শী, তাঁর সৃষ্টি উপভোগের সামর্থ্য রসিককে চেষ্টার দ্বারা গড়ে নিতে হয়। কবিতার দুরূহতার মূলে পাঠকের আলস্য—সুধীন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্তে সম্ভবতঃ নীরেন্দ্রনাথের সমর্থন আছে। নীরেন্দ্রনাথ যেহেতু কবি সেইহেতু সাধারণ পাঠকদের তুলনায় অনেক বেশী স্পর্শকাতর ও স্ব-গোত্র-প্রেমিক ; সুতরাং তিনি যে একথা বলবেন

> আমরা তাঁদের পিছিয়ে আসতে বলব কেন ? আমাদেরই উদ্দেশে দূর থেকে যে ইঙ্গিত, যে সংকেত তাঁরা পাঠাচ্ছেন, আমরা বরং তার তাৎপর্যকে যতটা সম্ভব, বুঝে নেবার চেষ্টা করব।

তাতে সংশয় কী ! কিন্তু যিনি ইঙ্গিত বা সংকেত পাঠাচ্ছেন, পাঠকের অভিসার হবে তাঁর অভিমুখে তা-ই কি একমাত্র সত্য ? এই দাবি কি একপাক্ষিক নয় ? কবি-সাহিত্যিক ও পাঠকের যাত্রা পরস্পরের অভিমুখে। সুতরাং কবিকে বোঝার জন্য পাঠকের প্রচেষ্টার মত পাঠককে সহায়তা করার জন্য কবিরও আগ্রহ কাম্য। কবি-সাহিত্যিকদের ভুললে চলবে না জাগতিক অধমর্ণ ও পাঠক কদাপি একগোত্রভুক্ত নন। দাতা হিসেবে তাঁদের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা গ্রহীতার উপরেই নির্ভরশীল। কবি অরুণ মিত্র—ফরাসী ভাষা-সাহিত্যে দক্ষ—র‍্যাঁবো এবং বদলেয়র-এরকথা স্মরণ করেছেন, 'কবির লক্ষ্য জনপ্রিয়তা নয়' এই সিদ্ধান্ত একটি প্রবন্ধে ঘোষণার মুহূর্তে। তিনি বিশ্বাস করেন 'পরিবর্তিত কাল' এবং 'ভিন্ন মানসিকতা' কবির জনপ্রিয়তা অর্জনে বাধা নয় ; কারণ 'কাব্য-প্রতিভার

উপলব্ধি' থাকে 'পাঠকের নিজস্ব বোধে, অনুভবে, প্রজ্ঞায় নিহিত'। নীরেন্দ্রনাথ পাঠকদের আগ্রহ ও শ্রম কামনা করেছিলেন কাব্যবোধের ক্ষেত্রে। অরুণ মিত্রও পাঠকের অনুভবে কবির স্বীকৃতির কথা বলেছেন অন্যভাবে। কিন্তু যিনি যেভাবেই বলুন, ভারতীয় আলঙ্কারিকদের 'সহৃদয় সামাজিকে'র ভূমিকা সম্পর্কে প্রত্যেক কবি-সাহিত্যিকই সজাগ থাকতে বাধ্য। সেকালে ছিলেন, একালেও আছেন। 'নিরবধি কাল' ও 'বিপুলা' পৃথিবীর কোন না-কোন সময়ে কোন না-কোন দেশে কবির সমানধর্মা কেউ আসবেনই এবং তিনিই কবিকে বুঝে নেবেন : এত দীর্ঘ প্রতীক্ষা কি কোনও অভিমানী ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ? 'কালের নৈবেদ্যে' লাগে যে সব আধুনিক ফুল, কোন কবির বাগানে যদি তা না ফোটে তাহ'লে সমকালের বিমুখতায় তিনি নিশ্চয়ই বিচলিত বোধ করেন। তবে যদি পরম নির্ভীক কোন স্রষ্টা বুঝতে পারেন যে তাঁর কবিতা 'মানুষকে মানুষ করে রাখা--অর্থাৎ তার মনুষ্যত্বকে রক্ষার কাজ'[১৯] করতে পারছে তাহ'লে তাঁর মনের জোরে তিনি তাঁর সাধনায় বহুকাল নিষ্ঠাবান থাকতে পারেন। তিনি অবশ্যই শুধু 'good poet' নন 'great poet' ও বটেন। তিনি সহজলভ্য ন'ন। শেকসপীয়র-গ্যেটে-রবীন্দ্রনাথ-তলস্তয়ের মতই দুর্লভ ও ক্ষণজন্মা।

নীরেন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। তাঁর এবং অরুণ মিত্রের কবিতার তুলনায় গদ্যের পরিমাণ অনেক কম। শঙ্খ ঘোষ এবং শিশির দাশ গদ্য-পদ্যে সমান সিদ্ধহস্ত। পেশায় অধ্যাপক, পরিমিত ভাষণ এবং বক্তব্য থেকে কেন্দ্রচ্যুত না-হওয়া এঁদের রচনার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কাব্য সৃষ্টি করতে গিয়ে এবং পাঠকরূপে অপরের কাব্যরসাস্বাদন কালে শঙ্খ ঘোষ যে-সমস্যাটাকে গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছেন তাহ'ল 'শব্দ'। ষাটের দশকের একেবারে প্রারম্ভে শঙ্খ ঘোষ এবং আশির দশকে শিশির দাশ প্রায় একই সমস্যার কথা বলেছেন। সমস্যাটা ঐ শব্দকে নিয়েই। কাব্য-শব্দের গুণ ও মান নিয়ে বর্তমান শতকের শুরু থেকেই ভাষাতাত্ত্বিক থেকে নব্য সমালোচকেরা (Neo-critics), শৈলী-বিশ্লেষকেরা, অবয়ববাদীরা সবাই ভেবেছেন। সমকালীনদের কাছে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ চিরকালের কবিদেরই নিষ্ঠুর ভাগ্য। পাউণ্ড-কামিংসের সচেতন চেষ্টা অথবা আরাগঁ-র ঠাট্টা বাদ দিলেও পাঠক-সমালোচকের দরবারে সাহিত্যিকদের উপস্থিত হতে হয়েছে অপরাধীর ভূমিকায়। নীরেন্দ্রনাথ পাঠকদের এগিয়ে আসতে বলেছিলেন লেখকের অভিমুখে। পাঠকের প্রস্তুতি তো আবশ্যিকই। কিন্তু লেখক ও পাঠক উভয়েরই সামর্থ্য প্রয়োজন কাব্য-বোঝানো এবং কাব্য-বোঝার ব্যাপারে। আশির দশকে শিশির দাশ যা লিখেছেন ষাটের এবং সত্তরের দশকে শঙ্খ ঘোষ তার কথাই বলেছেন বারবার। শিশির দাশ লিখেছেন :

> প্রকৃতপক্ষে কবি মাত্রেই বোঝেন শব্দের মধ্যে কোন কবিত্বের গুণ নিহিত নেই। কবিত্ব নিহিত শব্দের ব্যবহারে অর্থাৎ শব্দের যোজনায়।[২০]

১৯. 'কবিতা যা করতে পারে'। শামসুর রহমান : জীবনানন্দ আকাডেমী পত্রিকা : শরৎ ১৩৯৪।

২০. গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব। দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৫৫

কোন কোন শব্দকে বিশেষভাবে কাব্যগুণ-সম্পন্ন ভাবার কারণ নেই। 'বিপন্ন' এবং 'বিস্ময়' দুটি শব্দই অভিধানে লভ্য। কিন্তু যে-মুহূর্তে এই দুই-এর যোজনা করে জীবনানন্দ লেখেন 'আরো এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে...' ইত্যাদি, তখনই মনে হয় এমনটি আগে শুনিনি এবং উক্তিটি বেশ কাব্যগুণ সম্পন্ন। শিশির দাশ জীবনানন্দের এই বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করে অতঃপর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নালক' ( গদ্য রচনা) থেকে কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধার করে জানালেন 'এর কবিত্ব শব্দে সংহৃত নয়। এর শব্দময় দেহের সর্বত্র সঞ্চারিত। তাই বিশেষভাবে কবি-ভাষা বা কাব্যিক রীতি কবিতার পক্ষে পীড়ন ও বিপজ্জনক।'[২১] শিশির দাশের এই লেখার দু'দশক আগে থেকে শঙ্খ ঘোষ তাঁর অনেক ক'টি লেখায় ব্যাপারটা বোঝাতে চেয়েছেন। শিশির দাশ যেমন লেখেন 'বিশেষভাবে কবি-ভাষা ও কাব্যিক রীতি' কবিতার পক্ষে বিপজ্জনক, ১৯৬২-তে শঙ্খ ঘোষও তেমনি বলেছিলেন 'কবিতার শব্দ নামে পৃথক কোনো বস্তু নেই, সমস্ত প্রচলিত শব্দই কবিতার শব্দ'।[২২] এর কিছু আগে লিখেছেন 'নতুন শব্দের সৃষ্টি নয়, শব্দের নতুন সৃষ্টিই কবির অভিপ্রায়'।[২৩] শব্দের নতুন সৃষ্টি নির্ভর করে শব্দ-যোজনা ও শব্দ-ব্যবহারের উপর। প্রাচীন, অর্বাচীন, ও লৌকিক সব শব্দই কাব্যিক রহস্যময় ও অলৌকিক ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠতে সক্ষম শুধুমাত্র যোজনার গুণে। বস্তুতঃ শব্দের মাহাত্ম্য সম্পর্কে দুই অধ্যাপক-কবি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। শঙ্খ ঘোষ শব্দের তরঙ্গিত রূপের রহস্য বোঝাতে গিয়ে 'ছন্দের আলোড়ন' এবং 'শব্দের আলোড়ন'-এর অভিন্নত্বের কথা বললেন। আবার তাঁর মতে শব্দ যেমন ছন্দের তরঙ্গে বাঁধা, তেমনি শব্দই পৌঁছিয়ে দেয় সত্যের গভীরে, সে সত্য জীবন সত্য। ১৯৭২-এ লেখা 'শব্দ আর সত্য' প্রবন্ধের শেষাংশটুকু অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তীব্র :

> জন্ম আকস্মিক, মৃত্যু অনিবার্য, যৌনতা অমোঘ : এই সব নিত্য সত্যের ঘোষণাটুকুই কবিতার সব নয়। এই সব সত্যের উপর ভর করে আছে যে জীবন, তাকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংঘর্ষে দেখাই কবিতার সত্য। সেই সত্যের সামনে কবির আমি আর তাঁর বাইরের সমাজ কেবলই মুখোমুখি হয়, কেবলই তার সংঘর্ষ, আর সেই সংঘর্ষ থেকে কেবলই আরেকটি তৃতীয় সত্তার উন্মেষ।... আজকের দিনের ক্ষুধার্ত-কবিকে, সমস্ত কবিকেই, যিনি ঠিক ঠিক বলতে পারবেন যে কবিতার কাজ হলো 'যা সত্য তাকে সরাসরি বলা' নিজের যে সত্যের সঙ্গে নিজের কোনো কারচুপি চলে না কখনো :

কবির নিজের অভিজ্ঞতাময় জীবনে বহির্জগৎ ও ব্যক্তি-জীবনের সংঘর্ষে এমনই একটি সত্য বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে একদিন প্রার্থনার রূপে ব্যক্ত হতে চেয়েছিল, যখন লিখেছিলেন তাঁর অসামান্য কবিতা : 'বাবরের প্রার্থনা'। কবিতাটির জন্মকালে রুগ্না মেয়ের মুখখানি হয়ত কবির মনে ভাসে। কিন্তু সে সত্য অর্থাৎ কবির ব্যক্তি-জীবনের

২১. গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব। দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৭৬
২২. নিঃশব্দের তর্জনী : 'শব্দের পবিত্র শিখা'। পৃ. ২৭
২৩. নিঃশব্দের তর্জনী—পৃ. ২৬

একটি ঘটনা, না জানলেও কবিতাটা পাঠকের কাছে কবিতা হয়ে গেল ; যেহেতু ব্যক্ত সত্যে অন্য মাত্রা এসে গিয়েছে অতি পরিচিত শব্দের ডানায় ভর করে :

> এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
> আজ বসন্তের শূন্য হাত—
> ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
> আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।
> ... ... ... ... ...
> জাগাও শহরে প্রান্তে প্রান্তরে
> ধূসর শূন্যের আজান গান ;
> পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল
> আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

ব্যক্তির অন্তরঙ্গ প্রার্থনা কাব্যে মূর্তি পায় কোন এক প্রাচীন উপাখ্যানের আশ্রয়ে ; যেহেতু তা জীবন সত্য। অনুরূপভাবে 'সামাজিক যে-কোনো ঢেউয়ের আঘাতে কেঁপে ওঠেন' যে-কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর কবিতার পাঠক পাঁচ-দশ বছরের কলকাতার ফ্ল্যাটের ইতিবৃত্তে ঘূর্ণির মতো ঘুরতে ঘুরতে জীবন সত্যকে দেখেন। ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজ থেকে দেশ, দেশ থেকে পৃথিবীতে লেখক-পাঠকের অভিজ্ঞতার বলয় ক্রমেই যত বাড়তে থাকে ততই সত্য তার পরিধি বাড়াতে থাকে ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে। 'শব্দের পবিত্র শিখা' পাঠককে চিনিয়ে দেয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা অজানা রহস্যনিকেতন। শঙ্খ ঘোষ কবি হিসেবে কবির দায়িত্ব স্পষ্ট জানান—

> সংকটমুহূর্তে সুবেদী কবিদল যে আর্তনাদ করে উঠবেন, এতো তাঁদের চরিত্রেরই পক্ষে সংগত। কর্তব্যবোধে নয়, পারিপার্শ্ব বিষয়ে তাঁরা আতুর হয়ে ওঠেন স্বভাববশেই।[২৪]

তবু তিনি Artistic-Personality-র নিরুত্তেজ বিশুদ্ধ স্পর্শকাতর রূপটি ঠিকই লক্ষ্য করেন। 'কবির অন্তর্গত সত্তা অনেকটা সাংখ্যের পুরুষের মতো নিষ্ক্রিয়, স্থির, সাম্যাবস্থায় স্থিত।' 'অন্তর্গত সত্তা'কে 'সাম্যাবস্থায় স্থিত' রেখেই 'সুবেদী কবিদল' 'পারিপার্শ্ব বিষয়ে' আতুর হয়ে উঠতে পারেন— এই কথা বলে কবির ব্যক্তিসত্তা ও স্রষ্টাসত্তার সহাবস্থানের রূপটি শঙ্খ ঘোষ যথাযথ ব্যক্ত করেছেন। অন্তর্যামী 'এক' এবং বহির্জগতের 'বহু'র ঐক্যকে তাঁর নিজের মত করে শঙ্খ ঘোষ এমনভাবে ব্যক্ত করলেন যার সঙ্গে রবীন্দ্রিক সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ নেই, অথচ মন্তব্যটি তাঁরই।

রবীন্দ্রোত্তর শঙ্খ ঘোষের মত এবং আরও অনেকের মত অধ্যাপক-কবি শিশির দাশও 'গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব'[২৫] আলোচনায়, অথবা 'কবিতার মিল ও অমিল' সন্ধানে গিয়ে শব্দময় কাব্যশরীরের সৌন্দর্য ও প্রাত্যহিক জগতের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক খুঁজেছেন।

২৪. নিঃশব্দের তর্জনী পৃ. ৭০-৭১।
২৫. দে'জ পাবলিশিং—১লা বৈশাখ ১৩৯৪

যদিও তিনি শঙ্খ ঘোষের মতই বলেন যে পদ্য 'ভাষা'কেই নতুন করে সৃষ্টি করে, পদ্যের কোন meta-language নেই, তবু তাঁর মনে হয়েছে যে গদ্য ও পদ্যের জন্ম হয়েছে পৃথক সময়ে, ভিন্ন কারণে।—

> প্রাচীন সমাজে তাই অনেক ক্ষেত্রেই কবি ঋষি পুরোহিত একই ব্যক্তি। পদ্যের ব্যবহারও সেখানে যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক রহস্যময়। গদ্যের ব্যবহার যেখানে মূলত মানুষ ও প্রকৃতি বা মানুষ ও দেবতার সম্পর্ক রচনায়, মানুষের জ্ঞানের অনধিগত জগতে প্রবেশের জন্য, গদ্য সেখানে চেষ্টা করেছে বিমূর্তন আয়ত্ত করতে। পদ্যের চেষ্টা মূর্ত করার।

পদ্যভাষা জ্ঞানের বাইরে থেকে ছিনিয়ে আনে উপাদান তারপর চেষ্টা করে তাকে Concretise করতে। কবির সাধনা জীবন থেকে পলায়ন নয়। জীবনের অতীতকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করাই তাঁর লক্ষ্য। 'কাব্য'কে শিশির দাশ 'নিছক কাব্যিক' থেকে পৃথক করে গদ্য ও পদ্য উভয়েই যে জীবন সম্ভব সে কথা বললেন—

> কাব্যের উপাদান বা কাব্যিকতার জগৎ তাই প্রাত্যহিক বা দৈনন্দিন জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তারই অন্তর্গত। যেখানে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টা সেটাই নিছক কাব্যিক।[২৬]

অপর পক্ষে,

> গদ্য নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে ধীরে ধীরে বিরাট বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে—মানুষের চিন্তা ও কর্মের সমস্ত জগতে. সে ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে বিচিত্র, শতশীর্ষ বাসুকীর মতো সে ধারণ করে আছে কর্মের বিশ্বভার।[২৭]

'কবিতার মিল অমিল' নামক (পরিশিষ্ট সহ) সাতটি প্রবন্ধের সংকলনে রচনাশৈলীর বৈচিত্র্যের দিকে শৈলী বিজ্ঞানীর দৃষ্টি মেলে ধরেছেন শিশির দাশ। বিভিন্ন সময়ে লেখা বিচ্ছিন্ন এই প্রবন্ধগুচ্ছের মধ্যে অন্তর্নিহিত একটি সংগতি ধরা পড়ে। সাহিত্যবিচারে অধুনাতন Stylistics পদ্ধতি ব্যবহারে লেখক উৎসাহী। জীবন-বিচ্ছিন্ন নয় সাহিত্য, রূপ তার গদ্য বা পদ্য যা-ই হোক—এই মৌলিক বিশ্বাস থেকে শিশির দাশ সাহিত্যের মুখ্য উপাদান যে ভাষা সেদিকে তাঁর ভাবনাকে চালিত করেছেন। তাঁর প্রাগুক্ত দু'খানি গ্রন্থে সবচেয়ে বেশী উল্লেখ মিলছে রবীন্দ্রনাথের। শঙ্খ ঘোষও সাহিত্যের প্রধান উপাদান ভাষা যে 'নিঃশব্দের তর্জনী' তুলে ধরে কাল থেকে কালান্তরের দিকে সেই সত্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভাষা-ছন্দ-অলংকার-কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সাহিত্যের 'পূর্তবিভাগ' এবং এই তিন বিষয়ে তিনিই এখনও পর্যন্ত শেষ কথা বলেছেন। নানাজনে উত্তরকালে তাঁরই কথা উচ্চারণ করেছেন বিভিন্ন ভঙ্গীতে। সাহিত্যের প্রাণ রবীন্দ্রনাথ সন্ধান করেছিলেন রূপসৃষ্টির যাদুতে এবং রসের মধ্যে। অমিয়চন্দ্রের কাছে

২৬. গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব—পৃ. ৬১।
২৭. ঐ পৃ. ৬৪-৬৫

রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে ( ১৩৪৩ ) নিজের সমস্ত জীবনের সিদ্ধান্ত এককথায় জানাতে গিয়ে পারিভাষিক অর্থ-তাৎপর্য বাদ দিয়ে 'রস' শব্দটিকে আশ্রয় করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু 'চাই আনন্দের সাহিত্য' বলে শ্লোগান তুললেও আনন্দ বলতে যে 'রস' বোঝাচ্ছেন, একথা বলেন নি। 'রস' শব্দের জন্ম যে যুগে সেই যুগের অর্থতাৎপর্যে 'রস'কে একালে আর স্বীকার করা যায় না বলে কি সাহিত্যের উপাদান-বিগ্রহ প্রসঙ্গে স্রষ্টা-সমালোচকদের এই রূপ-মনস্কতা ? 'রস' বলতে রূপের গুরুত্ব সেকালে তিরস্কৃত হয় নি। কিন্তু ঐ অর্থ-তাৎপর্যে একালের পাঠককে দীক্ষিত করা মোটামুটি অসম্ভব জেনেই 'আনন্দ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন সমালোচকেরা এবং আনন্দের আধার যে শব্দনির্ভর রূপ সেই রূপের সবিশেষ বিশ্লেষণ করেছেন। শঙ্খ ঘোষ-শিশির দাশের শব্দ মনস্কতাও রসের বা আনন্দের জন্যই।

শেষ কথা কে বলবে ?

কবির কাজ কী ? জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক কী ?—এ সব প্রশ্নের উত্তর সাহিত্যিকের কাছ থেকেই কি কাম্য নয় ? মা ছাড়া কে বোঝাবে মাতৃত্ব ? 'Critics are the stupid who discuss the wise'—এই অভিযোগের উত্তরে স্রষ্টাকেই সমালোচকের ভূমিকা নিতে হয়। তবে সে-ক্ষেত্রে কবি-সমালোচক এলিয়টের সিদ্ধান্তের গুরুত্বও বিস্মৃত হওয়া যায় না

> When the critics are themselves poets it may be suspected that they have formed their critical statements with a view to justifying their poetic practice.[২৮]

কবি-সমালোচকের পক্ষে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। একথা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সত্য, সত্য এলিঅট সম্পর্কেও। তথাপি সাহিত্যিকেরাই তো জানেন সৃষ্টির মুহূর্তের যন্ত্রণা আবেগ আনন্দ। সুতরাং শক্তিমান কবি হয়েও একালের কোনও জিজ্ঞাসু-র প্রশ্নের[২৯] জবাবে শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলেন 'আমি অসামাজিক। ফলত সমাজ নামক বিশ্ব-মানবকল্যাণের কর্ম আমার দ্বারা হবে না'। অথবা, তাঁরই মত সোজা কথা সোজাসুজি ব'লেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'কবিতা লেখায় পৃথিবী বা দেশের কোন উপকার হয় না, সমাজ বদলায় না, শাসক বদলায় না'। কিন্তু এসব কথায় পাঠক বা শ্রোতার বেদনা কি অসংগত ? কবিতা পৃথিবীর উপকারে আসে না—কিন্তু কোন্ অর্থে ? সমাজ বা শাসক

২৮. *The use of poetry and the use of criticism*. Faber and Fabter Ltd 1954, p 29
২৯. আত্মপরিচয় : শৈলেশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। ১৩৮৫ ফাল্গুন দ্র. ৩৩-৩৫

বদলে পৃথিবীর উপকার করে না কবিতা—সুনীলের একথা সবাই কি মানবেন ? জ্যোতির্ময় দত্তের কাছে শঙ্খ ঘোষের খোলা চিঠির কয়েকটি কথা তো অত্যন্ত সত্য—

> একটি লেখার পর যদি দেখেন যে তার কোনো মূল্য হলো না কোনো হৃদয়ে, অমনি কি আপনি ধরে নেবেন যে রচনার আর মানে নেই কোনো ? বঙ্গোপসাগরের অবোধ্য টানেই-বা কতজন টানতে পেরেছেন আপনি ? এ সব ভাবনা আপনার নয়, লেখাটাই আপনার কাজ।[৩০]

লেখাটাই লেখকের কাজ ; সুতরাং তিনি যদি সুবেদী হন, যদি পারিপার্শ্বের টানকে বলপূর্বক অস্বীকার না করেন তবে তাঁর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, তাঁর কবিতার উপর আঁচড় কাটবেই তাঁর দেশ, কাল। কবির 'আমি' আনন্দ পায় অতএব কবিতা জন্ম নেয় এবং 'কেউ বরং কিছু আনন্দ পায়' তাই কবিতা পড়া হয়—এ সব কথা সুনীল[৩১] যত হাল্কা ঢঙেই বলুন 'আনন্দ পাওয়া' এবং অপরকে 'আনন্দ দেওয়া' অতই কি সহজ ? আনন্দ তো একটা উপলব্ধির নাম। যিনি সেই আনন্দ দান করেন এবং যিনি তা লাভ করেন তাঁরা কেউই বলতে পারেন না কিভাবে আনন্দ দেওয়া যায় এবং পাওয়াই বা যায় কি ক'রে ? প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকেরা রসকে যে 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর' বলেছিলেন একালে আর কেউ তা উচ্চারণ করেন না, সম্ভবতঃ ব্রহ্ম এ-কালে অক্ষম এবং অনালোচিত বলেই। তবু কথাটাকে একটু উদার দৃষ্টিতে দেখলে তার তাৎপর্য কিন্তু হারিয়ে যায় না। 'রস' অথবা 'আনন্দ' স্বল্পাক্ষরের শব্দ হলেও দু'এক কথায় বোঝানোর নয়। অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং ব্যঞ্জনাগর্ভ এই শব্দ দুটি সহজে উচ্চার্য হলেও সহজে লভ্য নয়। সুতরাং সুনীলের 'আনন্দ পাওয়া' এবং 'আনন্দ দেওয়া' কথা দুটি নিতান্তই কৌশলে 'কমিটমেন্ট'-এর রাস্তা পাশ কাটিয়ে যাওয়া মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞানীর সংখ্যার মত আনন্দদাতা এবং আনন্দপ্রাপকের সংখ্যা খুবই সীমিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ ক'রে অনেকেই 'আনন্দ'-এর কথা বললেও একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বলেছিলেন যে, সাহিত্য সত্যকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়ে এবং মনোরম করে ফুটিয়ে তুলে আনন্দ দেয় এবং 'সত্য' হ'ল তাই যাকে 'হৃদা মনীষা মনসা' জানা যায়। সুতরাং সত্য যদি কেবলমাত্র হৃদয়-নির্ভর না হয়, তাহ'লে প্রবাহিতজীবনের কাছে কি লেখকের কোন 'কমিটমেন্ট' থাকবে না ?

শিল্পের নিজস্ব চাহিদার কাছে, জীবনের কাছে কোন্ স্রষ্টা 'কমিটেড' নন ? 'কমিটেড' মানে তো বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি অন্ধ আনুগত্য নয়। কবি কৃষ্ণ ধরের অভিমত এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য হতে পারে :

> প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে আমার সংস্রব নেই। আমি মনে করি কবি বা শিল্পীর মুখ্য দায়িত্ব তার কাল ও তার সমাজের প্রতি। সমাজ সত্যের ছায়া তার শিল্পকে মহিমান্বিত করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। তবে কবিতা

৩০. শব্দ আর সত্য : পৃ. ১৯

৩১. 'আত্মপরিচয়'—শৈলেশ ভট্টাচার্য-সঙ্কলিত দ্র পৃ. ২৯-৩২

> তো একটি শিল্প। তার নিজস্ব দাবি অনেক। সেই দাবি মেনে নিয়েই সামাজিক সত্যকে শিল্পমন্ডিত রূপে প্রকাশ করতে হয়। আমিও তা-ই করবার চেষ্টা করি।[৩২]

তাহ'লে সচেতন শিল্পী তাঁর স্বাধীনতা বিসর্জন না দিয়েও জীবন এবং সেই হেতু সমাজকে মিটিয়ে দিতে পারেন তাদের প্রাপ্য—এই চিন্তা Politically 'কমিটেড' ন'ন এমন স্রষ্টার কাছে বাতিল হয়ে যায় নি আজও। তবে মতাদর্শের বিভিন্নতা চিন্তার স্বাস্থ্যসূচক। দুর্ভাগ্য শুধু এই যে, কবি-সাহিত্যিকেরা একালে মুখ খুলছেন কম। জগন্নাথ চক্রবর্তী এই আশঙ্কাই প্রকাশ করেছেন—'পাঠককে তৈরি করার কাজটি আমরা ফেলে রেখেছি'[৩৩]।

জন্ম লগ্নেই যেমন কেউ কবি ন'ন, ক্রমশঃ কবি হয়ে ওঠেন; তেমনি জন্মেই কেউ পাঠক ন'ন, পাঠক হয়ে ওঠেন। পুনঃ পুনঃ কাব্যানুশীলনের অভ্যাসে পাঠকের চিত্তমুকুর স্বচ্ছ হয়ে ওঠে এবং কাব্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয়। কিন্তু পাঠক শুধু নিজের আন্তরিক তাগিদে পাঠক হতে পারেন না, লেখকের সাহায্যও তাঁর প্রয়োজন হয়। সেই কারণে সমকালের পাঠকের কাছে যে-কবি দুর্বোধ্যতার দায়ে অভিযুক্ত হন, আগামী প্রজন্মের শিক্ষিত 'সহৃদয়' তাঁকে অনায়াসে গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ লেখক সচেতন-পাঠক গড়ে তোলেন নিজের অজান্তেই। এই জন্যই কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত বললেন:

> কবিদেরও মুখ খোলা দরকার, নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলা দরকার[৩৪]।

'কবিতার মুহূর্ত' সকলেই লিখুন, এমন দাবি করা হয়ত সংগত নয়; কিন্তু লেখক ও পাঠক উভয়কে নিয়েই যখন সাহিত্যের সংসার তখন সাহিত্যিকদের কেন আত্মোন্মোচনের এই অনিচ্ছা? সে কি কবি-সাহিত্যিকদের স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতা, না কি দর্পণের প্রতিবিম্বে ভীতি? না কি এই বিশ্বাসে পৌঁছে যাওয়া—শেষ কোথা? শেষ কথা কে বলবে?

---

৩২. 'আমার কবিতা': আত্মপরিচয়: শৈলেশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত পৃ. ২৬-২৮
৩৩. 'আত্মকথন': ঐ দ্র. পৃ. ৫০-৫৫
৩৪. আত্মপরিচয়: ঐ দ্র. পৃ. ৯-১৩

# নির্ঘণ্ট